কিভাবে সুখী হবেন?

How to be happy ?

كيف تكون سعيدا؟

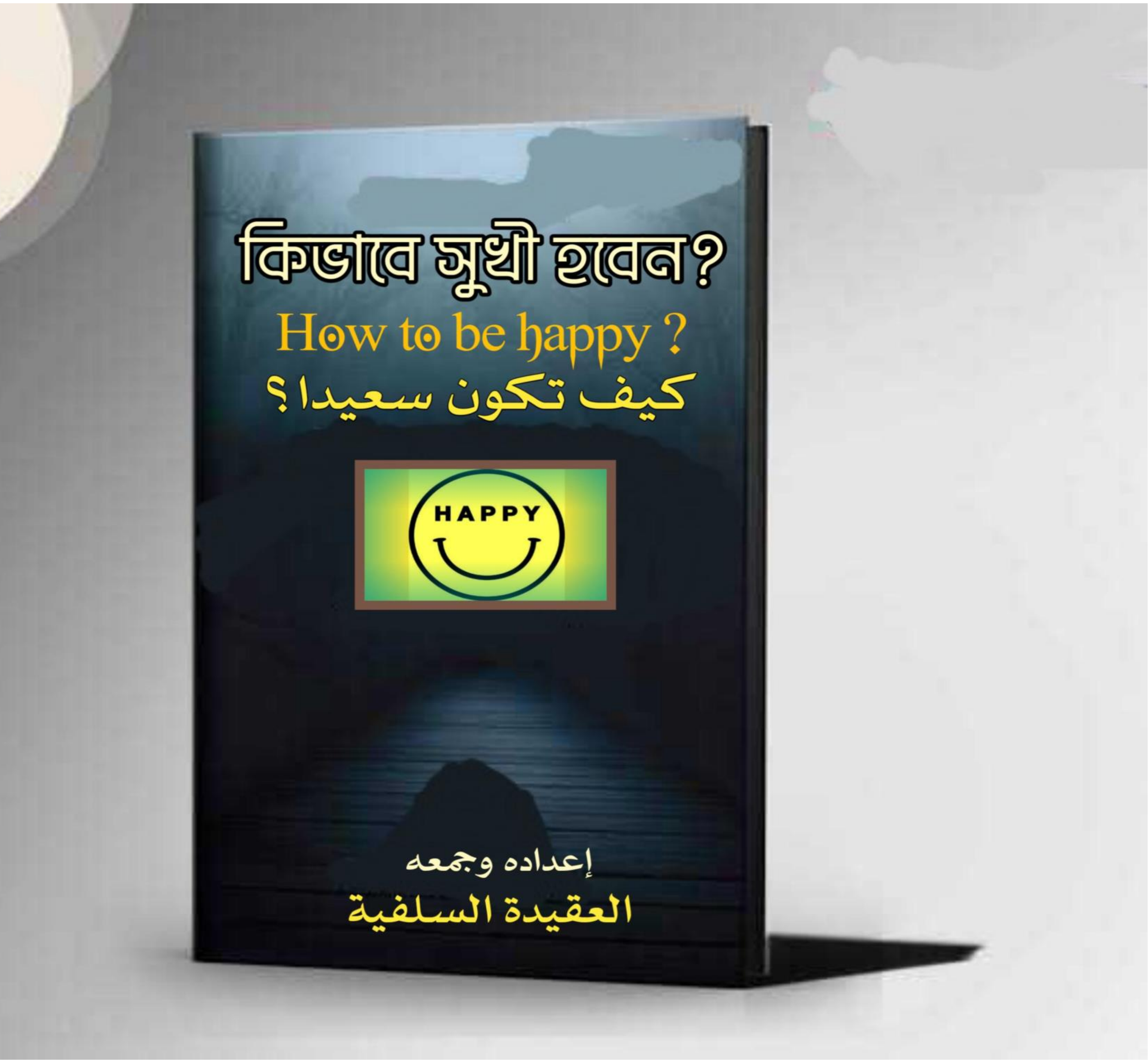
কিভাবে সুখী হবেন?
How to be happy ?
كيف تكون سعيدا؟
HAPPY
إعداده وجمعه
العقيدة السلفية

ভূমিকা

إنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،ونمُؤْمِن به ، ونتَوَكَّلُ عليه، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلُلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا...

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »

★وقال تعالى في سورة الروم : { ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } [سُورَةُ الرُّومِ: ٤١]

وقال تعالى في سورة الزاريات: { وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥٨) } [سُورَةُ الذَّارِيَاتِ: ٥٦-٥٨]

আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা। তিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়ন করার আদেশ করেছেন এবং তার আনুগত্য

করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্য এবং এখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির নিকট। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ } [سُورَةُ الأَنبِيَاءِ: ٢٥]

তোমার পূর্বে আমি যাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি তাকে আদেশ প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

অতঃপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নাই। যদিও মুশরিকরা এটিও পছন্দ করে থাকে।
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর,তাঁর পরিবারের উপর, তাঁর ঐসব সাহাবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, যারা তাঁর সাথে হিজরত করেছেন, জিহাদ করেছেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন। সেসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তার ওইসব আনসার সাহাবী উপর ও সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন যারা তাকে

মদিনায় আশ্রয় দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অজস্র শান্তিধারা বর্ষিত হোক।

★কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা: আমরা সবাই বড় হতে চাই, সফল হতে চাই, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হতে চাই, সুখে শান্তিতে দুনিয়ার বুকে থাকতে চাই; কিন্তু আমরা ক'জন জীবন পথে সৌভাগ্যবান হতে পারি? আমরা ক'জন সুখের চূড়ান্ত শিকরে আরোহণ করতে পারি? সুখের বা শান্তির শিকরে আরোহন করতে পারলেও কি সেই সৌভাগ্য আমাদের অন্তরে শান্তি এনে দিতে পারে? যদি না পারে তাহলে কিসের আশায়, কিসের নেশায় আমরা ছোটাছুটি করতেছি দুনিয়ার বুকে। সৌভাগ্য, সফলতা, সুখ-শান্তির পথ তো অনেক দীর্ঘ ও কন্টকাকীর্ণ; কিন্তু এই সুদীর্ঘ ও কন্টকাকীর্ণ দেওয়ার পরও যখন কেউ প্রশান্তি আর সন্তুষ্টির সাগরে আবগাহনের অনুভূতি না পাই। বস্তুতঃ তখন তা ব্যর্থত তাই পর্যাবসিত হয় ।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا (٩) وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا (١٠) } [سُورَةُ الشَّمۡسِ: ٩-١٠]

নিঃসন্দেহে সে সফল হবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে; এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।

কিভাবে সুখী হবেন?

أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته – يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

সম্মানিত পাঠক বন্ধুরা! আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদের সবাইকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিপদ-আপদ এবং সকল সমস্যা থেকে উত্তোলন করার তৌফিক দেবেন।যে তাকওয়া অবলম্বন করলে জান্নাতে যাওয়ার সুভাগ্য আমাদের হবে, যে তাকওয়া অবলম্বন করার আমাদের বিকল্প কোন কিছুই নেই দুনিয়ার বুকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাত দিবেন এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا }[سُورَةُ مَرۡيَمَ: ٦٣]

যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী হবেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এই জান্নাত তাকে তিনি ওয়ারিশ হিসেবে দিবেন,জান্নাত ওয়ারিশ করবেন তাদেরকে যারা তাকওয়ার অধিকারী হবে, আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে না তাদের জন্য সেই সুযোগ এবং সুসংবাদ নেই, সুতরাং থাকো অবলম্বন ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই। আর তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যেখানে আপনাকে দেখতে চান না সেখানে যেন আপনি না থাকেন যেখানে আপনাকে দেখতে চান সেখানে যেন আপনাকে পাওয়া যায়,আপনাকে যেরকম মসজিদে দেখতে চান এবং আপনাকে মসজিদে পাওয়া যায় এটাই হচ্ছে তাকওয়া, আর আপনাকে দেখতে চান না কোন

হারাম জায়গায় সেখান থেকে দূরে থাকবেন এটাই হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া হচ্ছে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার জন্য অবলম্বন।যে অবলম্বন অর্জন করলে আপনি দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে আটকে পড়বেন না আল্লাহ তাআলা সব জায়গা থেকে উদ্ধার করবেন এটা অবলম্বন করার জন্য আপনার আমার সবার প্রতি আল্লাহর নির্দেশকে গনিমত মনে করি,

التقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال – تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. – النساء - 132

আগের এবং পরে সবার জন্য ওসিহত হচ্ছে যেন আমরা তাকে অবলম্বন করি,, দুনিয়ার বুকে যে ব্যাক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে,এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন:

۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ ۔ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ – خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ – وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۔

سُورَةُ هُودٍ: ١٠٥-١٠٨

যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কেউ দুর্ভাগা, আর কেউ সৌভাগ্যবান। অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে জাহান্নামে,এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে*, অবশ্য তোমার রব যা চান**। নিশ্চয় তোমার রব তা-ই করে যা তিনি ইচ্ছা করেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতে থাকবে সেখানেই স্থায়ী হবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে অবশ্য তোমার রব যা চান,এটা এক নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার অর্থাৎ, এমন অফুরন্ত অনুদান যা শেষ হওয়ার নয়।

★ চারটি জিনিস মানব জীবনে দুনিয়ার বুকে সৌভাগ্যের বিষয়,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এই মর্মে বলেছেন,

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ – رَوَاهُ ابنُ حِبّان.

সা’দ বিন আবী অক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধবী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বা সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ি এবং খারাপ সওয়ারী (গাড়ি)।”ইবনে হিব্বান ৪০৩২,বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৫৫৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২ নং

*নবী (সাঃ) বলেনঃ একজন মুসলমানের জন্য প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্যের নিদর্শন (আবু দাউদ, হাকিম)।

*চারটি জিনিস দুনিয়ার বুকে সৌভাগ্যের প্রতীক,

০১- সৎ স্ত্রী,

০২- প্রশস্ত জায়গা,

০৩- সৎ-প্রতিবেশী,

০৪- সহজ বাহন,

*চারটি জিনিস দুনিয়ার বুকে দুর্ভাগ্যের প্রতিক,

০১-অসৎ স্ত্রী,

০২-অপ্রশস্ত বা সংকীর্ণ জায়গা বাড়ি,

০৩- অসৎ প্রতিবেশী,খারাপ প্রতিবেশী,

০৪- খারাপ বাহন,

*রাসূল সাঃ সৎ স্ত্রীর ব্যাপারে বলেছেন:

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ- الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا؛ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ- رَواه مُسلمٌ

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দুনিয়ার উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী। (ই.ফা. ৩৫০৬, ই.সে. ৩৫০৭) সহিহ মুসলিম, ৩৫৩৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ – رواه النسائي

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ নারী উত্তম ? তিনি বললেনঃ সে (স্বামী) যার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তার আনুগত্য করে, এবং (স্ত্রী) নিজের ব্যাপারে ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে এমন কাজ করে তার বিরোধিতা করে না। সুনানে আন-নাসায়ী,৩২৩১.

*সৎ প্রতিবেশী, ভালো প্রতিবেশী, এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ – النساء: 36

তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম,

মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ".

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাকে জিব্‌রীল ('আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতে থাকেন। এমনকি, আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।[মুসলিম ৪৫/৪২, হাঃ ২৬২৪, আহমাদ ২৪৩১৪] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৭৬)সহিহ বুখারী, ৬০১৪

◈ বাহনের ব্যাপারে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ " ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " . فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ .

আমর ইবনু শুআইব (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা কোন দাসী ক্রয় করে

তখন সে যেন বলেঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই”। আর যখন কোন উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দু’আ করে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আবূ সাঈদের বর্ণনায় রয়েছেঃ অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলবে। স্ত্রী এবং দাসীর ব্যাপারেও বরকতের দু’আ করবে। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৬০

◈দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষকে দেখবে সুখী হতে চায়।কেউ অসুখী হতে চায় না সুখের জন্য, সে কিনা করে টাকা-পয়সা অর্জন করে সুখের জন্য তার সারা জীবনটাকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। ঈমানদারও সুখ খুঁজে, কাফেররা সুখ খুঁজে,নেককাররা সুখ খুঁজে, বদকার সুখ খুঁজে,পুরুষসহ সুখ খুঁজে মহিলারা খুঁজে সুখ হচ্ছে অন্তরের বিষয় অন্তরের শান্তি।

◈শান্তির বা সুখের তিনটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে,

০১- নিজেকে শান্তির জন্য তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ শান্তি বা সুখের জিনিস নিজে বের করে নিতে হবে।

০২- জীবনটাকে শান্তিময় করে পরিচালিত করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর তাঁর রাসূলের দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে,

০৩- আখেরাতে শান্তির জায়গা জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে, অর্থাৎ আপনার প্রত্যাবর্তন স্থল ভাল না মন্দ এই চিন্তা সর্বসময়ই মাথায় রাখতে হবে মানে আখেরাতের চিন্তা করতে হবে,

◈কিন্তু আফসোস কিছু মানুষ শান্তি খুঁজে বেড়াই অন্য কিছুর মধ্যে, মূলত এগুলোর মধ্যে শান্তির বিন্দুমাত্র কিছু নেই শুধু অশান্তি আর অশান্তি বিদ্যমান রয়েছে,

সেগুলোর কিছু নমুনা আমি উল্লেখ করব,

০১- দুনিয়ার বুকে অনেক মানুষ সম্পদের মধ্যে শান্তি খুঁজে বেড়ায়, মূলত সম্পদেই শান্তি নয় বরং তাতে অশান্তি বেশিরভাগ বিদ্যমান রয়েছে,

আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে বলেছেন:

فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ – سُورَةُ التَّوۡبَةِ: ٥٥

অতএব তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়।

◈ইতিহাস সাক্ষী কারুনের উদাহরণ,, সে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী, ইতিহাসে এটাও বলা হয়েছে যে, তার ধন-সম্পদ এতই ছিল যে তার ধন-সম্পদের তালা চাবি বহন করতে লাগতো চল্লিশটি উট, কারুন সর্বপ্রথম মূসা আঃ এর অনুসারী ছিলেন, তারপরে তার ধন-সম্পদ এর অহংকারে গর্বিত হয়ে মুসা আলাই সালাম এর বিরুদ্ধাচারণ করেন, এত ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে ছিল কৃপণ, ইতিহাস সাক্ষী এত ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে শান্তি খুঁজে পাইনি ধন-সম্পদের মাঝে,

আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে বলেছেন:

◈ إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ – سُورَةُ القَصَصِ: ٧٦

নিশ্চয়ই 'কারুন' মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল (জুলুম করেছিল)। আমি তাকে এতটা ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম,যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান(শক্তিশালী)লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। (স্মরণ করুন তখনকার কথা) যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল-(অহংকার) দম্ভ করো না, আল্লাহ তাআলা (অহংকার কারীদের কে) দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।" (২৮:৭৬)

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡـَٔاخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ-
سُورَةُ القَصَصِ: ٧٧

আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তার দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন সদাশয় হয়েছেন তুমি তেমনি (মানুষের প্রতি) সদাশয় হও এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়ো না; কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।” (২৮:৭৭)

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةً وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ
سُورَةُ القَصَصِ: ٧٨

“সে (অর্থাৎ কারুন) বলল- নিঃসন্দেহে এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি। সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশীল? এবং (আজাব নাজিল করার সময়) অপরাধীদের ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।” (২৮:৭৮)

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ - سُورَةُ القَصَصِ: ٧٩

অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হয়ে আসল, যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, আহা! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকতো, বস্তুত সে তো মহা ভাগ্যবান, অর্থাৎ: সে তো নিশ্চয়ই বিরাট সম্পদশালী,
এই উক্তিগুলো কাফেরদের তারা কারুনে সম্পদ দেখে আফসোস করে বলবে যদি আমাদেরও থাকতো,,

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদাররা বলবে,

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗاۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ- سُورَةُ القَصَصِ: ٨٠

যারা (আল্লাহর পক্ষ হতে) জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলবে ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তারাই পাবে যারা ধৈর্য ধারণ করবে, অর্থাৎ ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না,

এটা গেল কারুনের সম্পর্কে উদাহরণ এ ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে কুরআনের সূরা কাসাসে,

◈ইতিহাসে আরো সাক্ষী রয়েছে ধন-সম্পদ সুখের বা শান্তির কারণ নয়,

যেমন বলা যেতে পারে উবাই ইবনে খালাফের সম্পর্কে, সেও কারুনের মত অধিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন,

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা সূরা হাক্কার মধ্যে বলেন:

مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ – هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ - سُورَةُ الحَاقَّةِ: ٢٨-٢٩

আমার ধন সম্পদ আমার কোন উপকারে আসলো না, আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল, (শেষ হয়ে গেল)।

*এরকম ভাবে ইতিহাস অনেক সাক্ষী রয়েছে অর্থ – সম্পদের মধ্যে কোন শান্তি নেই,

০২- প্রসিদ্ধতা, যশ,খ্যাতি,ভাইরাল,পপুলার, সেলিব্রেটি হওয়ার মাধ্যমে মানুষরা শান্তি খুঁজে বেড়ায়, অথচ এগুলোর মধ্যে কোন শান্তি নেই,

এই মর্মে রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম থেকে একটি সহী সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ ـ يَا عَبْدَ اللَّهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দেহ স্পর্শ করে বলেনঃ হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো।(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১১৪)

وَكَانَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: "إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّباحَ، وإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لمَرَضِكَ، ومِنْ حياتِكَ لِمَوتِكَ" رواه البخاري.

আর ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।’(সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫০)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ

সাহল ইবনু সাদ-সাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে। এই মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল ইমরানের বলেছেন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ – آل عمران:185
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى- البقرة:197
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ – الحج:1
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ – الحشر:18.

০৩- সার্টিফিকেট,লেখাপড়ার মাধ্যমে শান্তি খুঁজে বেড়ায়।অথচ এগুলোর মধ্যে কোন শান্তি নেই, রাসুলের সাহাবীরা কোন সার্টিফিকেট ও পড়ালেখা কিছুই তাদের ছিল না, কিন্তু তাদের অন্তরের শান্তি নিহিত ছিল, আরবিতে একটি কথা রয়েছে,,

كم من مشهور في الأرض
مجهول في السماء "
وكم من مجهول في الأرض
" معروف في السماء "

দুনিয়াতে অনেক প্রসিদ্ধ মানুষ রয়েছে যারা আসমানের অধিবাসীদের নিকট অপরিচিত। **আর দুনিয়াতে অনেক অপরিচিত মানুষ রয়েছে যারা আসমানে অধিবাসীদের নিকট পরিচিত,প্রসিদ্ধ ।**

০৪- নেতৃত্বের মোহ,পদমর্যাদা-পদবী, অনেক মূর্খ মানুষরা মনে করে পদমর্যাদার মধ্যে কি না কি সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে,, দুনিয়ার বুকে যারা পদমর্যাদা নিয়ে লাফালাফি করেছে তারা সবচেয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে

রয়েছে অথচ পদমর্যাদা সেটা নিজেই একটি অশান্তি কারণ,প্যারা দায়ক একটি জিনিস।

এ মর্মে রাসূল (সাঃথেকে একটি সহী সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا – وراه البخاري

আবদুর রহমান ইব্‌নু সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে ‘আবদুর রহমান ইব্‌নু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। (বুখারী পর্ব ৮৩ অধ্যায় ১ হাদীস নং ৬৬২২; মুসলিম ৩৩/৩, হাঃ ১৬৫২)

★ এ মর্মে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ- رواه البخاري

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা (ও আফসোসের) কারণ হবে। দুধদানকারী হিসাবে (ক্ষমতার দিনগুলোতে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগের দিক দিয়ে) ক্ষমতা কতই না ভাল। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি কতই না নিকৃষ্ট পরিণামবহ, (সহীহুল বুখারী: ৭১৪৮)

★ এই ক্ষমতার মোহ,পদমর্যাদা,নেতৃত্বের মোহ,পদবী নিয়ে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহ সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে১৩/১২৬ বলেন:

ক্ষমতা দুধদানকারী পশুতুল্য। কারণ ক্ষমতা থাকলে পদ, পদবী, সম্পদ, হুকুমজারী, নানা রকম ভোগ-বিলাসিতা ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়। কিন্তু মৃত্যু কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা যখন চলে যায়, তখন আর তা মোটেও সুখকর থাকে না। বিশেষত আখেরাতে যখন এজন্য নানা ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হবে তখন ক্ষমতা মহাজ্বালা হয়ে দেখা দিবে।

★আল্লামা আব্দুর রহমান সা'দী বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা জনগণের উপর কর্তৃত্বমূলক যে কোন পদ মানুষের চেয়ে নেওয়া উচিত নয় এবং সে জন্য নিজেকে যোগ্য বলে উপস্থাপন করাও কাম্য নয়; বরং এজন্য আল্লাহর নিকট দায়িত্ব মুক্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন প্রার্থনা করা উচিত। কেননা সে তো জানে না যে, শাসন ক্ষমতা তার জন্য কল্যাণকর হবে, না অকল্যাণকর। সে এও জানে না যে, এই দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে কি-না? তারপরও যখন সে দায়িত্বের জন্য আবেদন-নিবেদন করে, তখন তো তা পেলে তার নিজের দিকেই তা সোপর্দ করে দেয়া হয়। আর যখন বান্দার দিকে দায়িত্ব সোপর্দ করে দেয়া হয়, তখন সেজন্য সে আল্লাহর সহায়তা পায় না। তার সব কাজ সুচারু রূপে করতে পারে না এবং সাহায্য-সহযোগিতাও পায় না। কেননা তার ক্ষমতা চেয়ে নেয়া দু'টি অবৈধ বিষয়ের বার্তা প্রদান করে।

প্রথমতঃ পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি লোভ। এ ধরনের লোভ আল্লাহর সম্পদে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করে।
দ্বিতীয়তঃ এতে নিজেকে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবার এবং আল্লাহর সাহায্যের দরকার না লাগার গন্ধ রয়েছে।

যে জিনিস গুলো মানুষ কে শান্তি থেকে দূরে রাখে,
০১-কুফরি, আল্লাহকে অস্বীকার করা।কুফুরি করলে মানুষ শান্তি থেকে দূরে সরে যায় তার মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে,
কুফরবিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়।অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করবে না সে ব্যক্তিই অহংকারী কাফের।পরিশেষে...কুফরি শিরকের চেয়ে বেশি মারাত্মক। কারণ শিরকের দ্বারা আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে আত্মসমপর্ণ করা। মেনে নেয়া। যখনেই কোনো কাজ মেনে নেয়া হয় সেখানেই শান্তি বিরাজ করে। মেনে নেয়ার দিক থেকে ইসলামের একটি অর্থ হচ্ছে শান্তি।
এ মর্মে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলার সূরা আল ইমরানের ১০নং আয়াতে বলেন:
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ وَقُودُ ٱلنَّارِ – سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٠
যারা কুফরি করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোনো কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।’(সুরা আল-ইমরান:১০)

যারা কুফর বা আল্লাহকে অস্বীকার করে, কুরআনুল কারিমের তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর কুরআনে যে কাজে শাস্তির ঘোষণা এসেছে, সে কাজগুলোই কবিরা গোনাহ। তার মধ্যে কুফর বা আল্লাহকে অস্বীকারও একটি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেন –

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ (١٦١) خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ – سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٦١-١٦٢

নিশ্চয় যারা কুফরি করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সব লোকের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের অভিশাপ এবং সব মানুষের অভিশাপ। এরা চিরকাল এ অভিশাপের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আজাব কখনও হালকা করা হবে না বরং এরা বিরামও পাবে না। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৬১-১৬২)

আল্লাহ তায়ালার আরো বলেন:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ -سُورَةُ الأَنۡعَامِ: ١٢٥-١٢٦

সুতরাং আল্লাহ্‌ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপদগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ খুব সংকীর্ণ করে দেন; (তার কাছে ইসলামের অনুসরণ) মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশে উঠেছে [১] এভাবেই আল্লাহ শাস্তি দেন তাদেরকে,যারা ঈমান আনে না

ইবনে আববাস বলেনঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ হলোঃ তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া। [ইবন কাসীর] তারপর আল্লাহ বলছেনঃ “আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণতা করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারো আকাশে আরোহণ করা”। মুলত: বক্ষ সংকীর্ণ করার অর্থ, কঠিন, দুর্ভেদ্য করে দেয়া। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ মুনাফিকের কাল্ব হলো অনুরূপ সেখানে কোন ভাল কিছু পৌছুতে পারে না। [তাবারী; ইবন কাসীর] মুজাহিদ ও সুদী বলেন, এর অর্থ, সন্দেহে পড়ে থাকা। মানসিক অশান্তিতে বিরাজ করা। [ইবন কাসীর] এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম-কে এ দু'আ করার আদেশ দিয়েছেনঃ “হে আমার রব! আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিন”। [সূরা ত্বা-হাঃ ২৫] |

কুরআন, হাদীস-সুন্নাহর আলোকে কয়েক প্রকার কুফরের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হয়েছে :-

১. অহঙ্কারবশত কুফর : আল্লাহর হুকুম না মানা এবং তাঁর নির্দেশ না শোনা। আল্লাহ তায়ালার বাণী, ‘যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিশ ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো’ (সূরা আল-বাকারাহ-৩৪)। সুদ্দি বলেন, সে ওই সমস্ত কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো যাদেরকে আল্লাহ তখনো সৃষ্টি করেননি। যারা তার পরে কাফের হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো। মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরাযি বলেন, আল্লাহ ইবলিশকে কুফর ও পথভ্রষ্টতার ওপরই সৃষ্টি করেছেন,

তারপর সে ফেরেশতাদের আমল করলেও পরবর্তীতে যে কুফরির ওপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে তার দিকেই ফিরে গেল (ইবনে কাসির)।
২. মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে কুফর : আল্লাহ তায়ালা, তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল কিংবা কিতাবের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা। আল্লাহর বাণী, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগমন হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জাহান্নামই কী কাফিরদের আবাস নয়’ (সূরা আল-আনকাবুত-৬৮)

৩. দ্বীন থেকে বিমুখ থাকার মাধ্যমে কুফর : আল্লাহর বাণী,
‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়’ (সূরা আল-আহকাফ-৩)।
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। আর তা হলো- মানুষকে পরীক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, তার একটি নির্দিষ্ট সময়ও রয়েছে। প্রতিশ্রুত সে সময় যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান এসব নিয়ম-শৃঙ্খলা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন না এই আকাশ থাকবে, আর না এই পৃথিবী। আর ঈমান না আনার কারণে যখন তাদেরকে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়, তখন তারা তার কোনো পরোয়াই করে না। না তারা তার ওপর ঈমান আনে, আর না পারলৌকিক শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে’ (তাফসিরে আহসানুল বায়ান)।

৪. ঈমানকে প্রকাশ করে গোপনে কুফর : বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবিদার হলেও গোপনে কুফরে অভ্যস্ত হওয়া। কুফরের লালন করা। আল্লাহর বাণী, 'এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফর করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না' (সূরা আল-মুনাফিকুন-৩)। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মুনাফিকরাও কাফের।

৫. ধারণা সম্পর্কিত কুফর : ধারণা হলো দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত। রাসূলদের সত্যতা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে ইতস্তত করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস না রাখা। আল্লাহর বাণী, 'আর নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাবো। তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে জিজ্ঞেস করে তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের শরিক করি না' (সূরা আল-কাহফ : ৩৫-৩৮)।

কাফেরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন- সূরা হজে এদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'এরা দু'টি বিবদমান দল; তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। সুতরাং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি'(২২. আয়াত-১৯)। আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে, সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক

কিংবা পূর্ববর্তী যুগের। ইহুদি, নাসারা, সাবেয়ি, মাজুস ও শির্ককারী সবাই এ কাতারভুক্ত। (ফাতহুল কাদির)। আর আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বোঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহিমের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ‘তাদের জামা হবে আলকাতরার’। অর্থাৎ তাদের জন্য আগুনের টুকরা দিয়ে কাপড়ের মতো করে তৈরি করে দেয়া হবে। (ইবনে কাসির)। সায়িদ ইবনে জুবাইর বলেন, এখানে জামাগুলো হবে তামার, যা গরম হলে সবচেয়ে বেশি তাপ সৃষ্টি হয় (ইবনে কাসির)।

০২- গুনাহ কাজ,

মূলত গুনাহের কাজে কোন শান্তি নেই সুখ নেই, যারা গুনার কাজে লিপ্ত তারা অশান্তির মধ্যে বিরাজ করতেছে, যেমন বলতে পারি গুনাহ কাজ করলে মনে অশান্ত অশান্ত একটি ভাব আসে, আল্লাহ রাসুলের যুগে এক সাহাবি যিনা নামক পাপ করার কারণে তার ভিতরে অশান্তি ভাব আসছে এই জন্যই সে গুনাহটিকে পবিত্র হয়ে শান্তিতে ফিরে যেতে চাই,রাসূলুল্রাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে অবস্থানকালে মায়াজ তাঁর কাছে এলেন।(মায়াজ বিন মালিক আসলাম গোত্রের লোক ছিলেন।)

সে বুঝেছে গুনাহর কি অশান্তি সে শান্তি ফিরে পাওয়ার জন্য যিনার গুনার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পবিত্র হওয়ার জন্য তার নিজের উপর রজম সাব্যস্ত করে নিলেন,

এটাই সাহাবীদের তেজস্বী ঈমান,

মায়াজ: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিনা করেছি।

নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। মায়াজ আবার সেই দিকে এলেন যেদিকে নবীজী মুখ করে ছিলেন।

মায়াজ: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিনা করেছি।

নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। মায়াজ আবার সেই দিকে এলেন যেদিকে নবীজী মুখ করে ছিলেন।

মায়াজ: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিনা করেছি।

নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। মায়াজ আবার সেই দিকে এলেন যেদিকে নবীজী মুখ করে ছিলেন।

মায়াজ: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিনা করেছি।

নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। মায়াজ আবার সেই দিকে এলেন যেদিকে নবীজী মুখ করে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি কি পাগল?

মায়াজ: না।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি হয়ত চুমা দিয়েছে বা চেপে ধরেছ বা তাকিয়েছ।

মায়াজ: না।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছে?

মায়াজ: জ্বি।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি কি সেটা এভাবে করেছ যে তোমার যৌনাঙ্গ তারটাতে প্রবেশ করেছে?

মায়াজ: জ্বি।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি কি এটা এভাবে করেছ যেভাবে সুরমাদানিতে সুরমার কাঠি ঢুকানো থাকে অথবা যেভাবে একটা দড়ি কূপে [ফেলে] রাখা হয়?

মায়াজ: জ্বি।

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি কি জানো জিনা কী?

মায়াজ: জ্বি। আমি তার সাথে অবৈধভাবে তাই করেছি যা একজন পুরুষ বৈধভাবে তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে। [নোট: ইসলামি বিচারক জিনার দায় স্বীকারকারি ব্যক্তিকে রজমের শাস্তির দিকে ঠেলে না দেবার জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হবেন।]

রাসূলুল্লাহ(সা.): তুমি যা বলছ তার ভিত্তিতে তুমি কী চাও?

মায়াজ: আমি চাই যে আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ(সা.): এই লোকের কি এমন কোন ব্যধি আছে যা তার মনকে প্রভাবিত করে বা সে কি পাগল?

মায়াজের পরিবারের লোকজন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! সে সুস্থ।

রাসূলুল্লাহ(সা.): [সে কি] অবিবাহিত নাকি বিবাহিত?

মায়াজের পরিবারের লোকজন: বিবাহিত, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ(সা.): সে কি মদ খেয়েছে?

[নোট: সে মাতলামি করে নির্দোষ হয়েও ভুল করে নিজের কাঁধে দোষ নিচ্ছে কিনা, যাচাই করছেন।]

একজন লোক দাঁড়াল এবং তার শ্বাস শুঁকে দেখল, কিন্তু মদের কোন গন্ধ পেল না। [9]

রাসূলুল্লাহ(সা.): তাকে নিয়ে যাও এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর।

জিনার পাপ,গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে শান্তি ফিরে পাওয়ার জন্য ঐ সাহাবী নিজের উপর রজম সাব্যস্ত করে নিয়ে গুনা থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হতে চেয়েছিলেন শান্তি পেতে চেয়েছিলেন, শান্তি খুঁজেছিলেন,

উপরোক্ত হাদীসটি সহীহ সূত্রে বুখারী ও মুসলিম এমনকি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আমরা এটাই বুঝতে পারলাম হাদিসটিকে যে একজন সাহাবী গুনা করে শান্তিতে থাকতে পারেনি অতএব গুনার

মধ্যে কোন শান্তি নিহিত নেই অশান্তি আর অশান্তি আমরা যেন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এই তৌফিক কামনা করি আল্লাহ তায়ালার নিকট,

*মানুষের মনের মধ্যে যখন গুনাহ করার প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠে; তখন তা দমন করা বা গুনাহ থেকে বিরত থাকা খুবই কষ্টের। কিন্তু উপায় কী? জেগে ওঠার গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে করণীয় কী? এ সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনাই বা কী?
গুনাহ করার সময় তা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টের। নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। কারণ গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে পারাই সফলতা। কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا – وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
'যে নিজের আত্মাকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করে সেই সফল হয় আর যে তাকে কলুষিত করে (সে) ধ্বংস হয়।' (সুরা শামস : আয়াত ১০)

★ গুনাহের কাজ দমনে করণীয়,,,,
গুনাহ বা পাপ-পঙ্কিলতার কাজ থেকে বিরত থাকতে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যায়। তাহলো-
১. আউজুবিল্লাহ পড়া,
মনের মধ্যে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আউজুবিল্লাহ পড়া। আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ঘোষণা করেন-

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ
'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করো।' (সুরা আরাফ : আয়াত ২০০)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم
অর্থ :বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

২. আল্লাহকে ভয় করা

দুনিয়ার প্রতিটি কাজের সময় নিজেদর মনে আল্লাহর ভয় রাখা। কাজের সময় এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ড লিখে রাখার জন্য দুইজন ফেরেশতা সব সময়ের জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।' (সুরা ইনফিতার : আয়াত ১০-১২)

তাই আল্লাহর অবাধ্য কোনো কাজ করা যাবে না। তাকে ভয় করতে হবে। কারণ তার অবাধ্য কাজ করলেই তিনি ক্রোধান্বিত হবেন এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

৩. দোয়া করা

মহান আল্লাহর কাছে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ ভীতির জন্য দোয়া করা। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলো-

اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا – اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) দান করো, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমিই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী, তুমিই তো হৃদয়ের মালিক ও অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম (জ্ঞান) থেকে যা কোনো উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে আশ্রয় চাই যা (তোমার ভয়ে) ভীত হয় না, এমন আত্মা থেকে আশ্রয় চাই যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে আশ্রয় চাই যা কবুল করা হয় না।' (মুসলিম)

৪. মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

গুনাহ করা অবস্থায় যদি কারো মৃত্যু সংঘটিত হয় তবে কেয়ামতের দিন তাকে গুনাহরত অবস্থায় উঠানো হবে। হাদিসে পাকে এসেছে-

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يُبْعَثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه المُؤمِنُ على إيمانِه والمُنافِقُ على نِفاقِه

'কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থার উপর সে মৃত্যু বরণ করেছে। মুমিনকে উঠানো হবে ঈমানের উপর এবং মুনাফিককে উঠানো হবে নেফাকির উপর।' (ইবনে হিব্বান)

মনে রাখতে হবে গুনাহকালীন সময়ে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী। পাপের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনুতাপ হবে দীর্ঘ মেয়াদি।

৫. সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা

গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করার বিকল্প নেই। তাই কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন মুখস্থ, ইসলামি বই-পুস্তক পাঠ, নফল নামাজ আদায় এবং দোয়া-দরূদ, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার ও তাওবাহ-ইসতেগফারে নিজেদের নিয়োজিত রাখার বিকল্প নেই।

৬. ভালো মানুষের সংস্পর্শে থাকা,
একাকি নির্জন স্থান ত্যাগ করে দ্বীনদার মানুষের সংস্পর্শে থাকা। তবে মা-বাবা, ভাই-বোন, দ্বীনদার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থাকলে গুনাহ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয় না। তাছাড়া গুনাহমুক্ত জীবনে জন্য ভালো কোনো আলেমের সান্নিধ্যেও থাকা যায়। এই মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ – سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٩٥

নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসে।
আবার মসজিদে গিয়ে জিকির-আজকার, তেলাওয়াত ও নফল নামাজ পড়ে কিছু সময় অতিবাহিত করা।
এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (রহ:) একটি বাণী রয়েছে:

قال الامام الشافعي رحمه الله: أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم لعل الله يرزقني صلاحا

যদি কেউ পরিবার থেকে দূরে কোথাও থাকে কিংবা দূরের কোনো দেশে অবস্থান করে তবে নিয়মিত পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পরিজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলা বা ফোনে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া। কিংবা দীর্ঘ দিন যোগাযোগ হয়নি এমন

দ্বীনদার ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে গুনাহের ইচ্ছা থেকে ফিরে থাকাও সম্ভব।

৭. অলস সময় না কাটানো,

অলস সময় কাটালে শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। তা থেকে বেঁচে থাকতে এমন বৈধ ও সাওয়াবের কাজ করা যা করতে ভালো লাগে। কিংবা এমন কোনও দুনিয়ার উপকারী কাজ করা, শরীর চর্চা করা বা বাইরে দর্শনীয় খোলাস্থানে ঘুরতে যাওয়া। ঘরে চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকা ঠিক নয়। অলস সময় থেকে বের হতে পারলেই শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহের কাজের প্রবল ইচ্ছা থেকে বের হওয়া সম্ভব।

৮. অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা,

সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখা, গান-বাদ্য শোনা বা অশ্লীল গল্প, উপন্যাস পড়া থেকে দূরে থাকাও গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার উপায়। কারণ অশ্লীলতা মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও কুকর্মের দিকে ধাবিত করে। অনুরূপভাবে যে সব উপকরণ হাতের কাছে থাকার কারণে মন গুনাহের দিকে ধাবিত হয় সেসব উপকরণ থেকে দূরে থাকাও জরুরী।

৯. ধৈর্যধারণ করা,

মনে প্রচণ্ড গুনাহের ঝোঁক দেখা দিলে সে সময়টিতে ধৈর্যধারণ করা। সবরের মাধ্যমে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা কিংবা গুনাহের কাজ থেকে আত্ম-সংবরণ করা আবশ্যক। কেউ পাপ কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা করার পর যদি তার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসে আর সে তা থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় গুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব

দান করবেন। হাদিসের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

وإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً

'আর সে যদি কোনও পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন।' (বুখারি, মুসলিম)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, গুনাহের কাজ করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হলে উল্লেখিত উপায়গুলো অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এ আমলগুলোর মাধ্যমে গুনাহের কাজ থেকে ফিরে থাকা।

গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই,

ইব্রাহিম আদহামের সেরা ৫ কি উপদেশ,,

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি একজন সুফি সাধক ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন। নিরহংকার জীবনে তিনি গোনাহমুক্ত জীবনের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। তার পাঁচটি উপদেশ যে কাউকে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। কী সেই পাঁচ উপদেশ?

একবার এক লোক ইবরাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহু আলাইহি কাছে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের জন্য এসেছিলেন। ওই ব্যক্তি হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহামকে বললেন, 'আমি বড় অপরাধী। আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন, যাতে আমি পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারি।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গোনাহমুক্ত জীবন-যাপনের চমৎকার পাঁচটি উপদেশ তুলে ধরেছিলেন। তাহলো-

আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে বিরত থাকাঅন্যায় বা অপরাধ করতে ইচ্ছা করলে আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে কিছুই না খাওয়া। এ কথা শুনে লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল- 'দুনিয়ার সব রিজিকই মহান আল্লাহর দেয়া। তাহলে তা কী করে সম্ভব?'যদি তা সম্ভব না হয় তবে আল্লাহর দেয়া রিজিক খেয়ে কীভাবে অপরাধ করা সম্ভব? সুতরাং আল্লাহর দেয়া রিজিক খেতে হলে অবশ্যই অন্যায় বা অপরাধ ছেড়ে দেয়া। কেননা তাঁর দেয়া রিজিক খেয়ে তাঁর অবাধ্যতা করার কোনো সুযোগই নেই।

আল্লাহর জমিন থেকে বের হয়ে যাওয়াযদি পাপ করতে হয় তবে, আল্লাহর জমিন থেকে বের হয়ে গিয়ে পাপ করা। এ কথা শুনেও লোকটি আগের চেয়েও বেশি হতবাক হয়ে বলল- 'হে ইবরাহিম! তা কী করে সম্ভব? পুরো জমিনই তো মহান আল্লাহর!এর মানে হলো- 'তুমি আল্লাহর জমিনে অবস্থান করে তাঁরই বিরুদ্ধাচরণ করবে? না, তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বরং জমিনে বিচরণ করতে হলে অবশ্যই পাপ কাজ ছেড়ে দেয়ার বিকল্প নেই।

-আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়াপাপ করার ইচ্ছা থাকলে আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে হবে। এ কথা শুনেও ওই ব্যক্তি বলল-এমন কোনো স্থান আছে কি যা মহান আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির বাইরে? আল্লাহ তাআলা তো ঘোর অন্ধকারের মাঝে পিপড়ার পদচারণা ও পদশব্দ

দেখেন এবং শুনেন।যদি আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার সুযোগ না থাকতে তবে গোনাহ বা অন্যায় ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে সময় নেয়াপাপ করার ইচ্ছে থাকা ব্যক্তি কি পারবে মৃত্যুর ফেরেশতার কাছ থেকে সময় নিতে? এ কথা কি বলার অবকাশ আছে যে, আমাকে আরও কিছু সময় দাও বা আমার প্রাণ হরণ করিও না।এ কথা শুনে লোকটি বলল- তা কী করে সম্ভব? কখনোই মৃত্যুর ফেরেশতা তার দায়িত্ব পালনে দেরি করবে না। সুতরাং মুক্তির পথ এটকাই গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করা। কারণ মৃত্যুর ফেরেশতা সব সময় প্রাণ নিতে প্রস্তুত। যে কোনো সময় হতে পারে মৃত্যু। তাই গোনাহের কাজ ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়।

জাহান্নামের দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা থেকে মুক্তি চাওয়াগোনাহমুক্ত জীবন লাভে পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তি সবশেষ পরামর্শ শুনা মাত্র কেঁদে ওঠলেন। আর বললেন- তা কী করে সম্ভব? জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতা কি সাজা থেকে মুক্তি দেবে?এবার হজরত ইবরাহিম বিন আদহামে কাছে পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তি বলতে লাগলেন-‘হে ইবরাহিম! থামো, যথেষ্ট হয়েছে। গোনাহমুক্ত জীবন লাভে, পাপাচার থেকে বিরত থাকতে এ পাঁচটি উপদেশই যথেষ্ট।আমি তাওবাহ করছি। যাতে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সব পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারি। গোনাহমুক্ত জীবন গঠন করতে পারি।

মনে রাখা জরুরি আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর জমিন থেকে চলে যাওয়া, আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া, মৃত্যুর

ফেরেশতার কাছে সময় নেয় এবং জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখার শক্তি ও সামর্থ কারোর নেই।

সুতরাং এ পাঁচ কাজ যথাযথভাবে আদায় করতে হলে, অবশ্যই পাপ কাজ ছেড়ে দেয়ার বিকল্প নেই। উল্লেখিত কাজগুলো যথাযথভাবে আদায়ে পাপ ছেড়ে দেয়াই মুমিন মুসলমানের অন্যতম কাজ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে তার জমিনে বিরচরণ করে, তার দেয়া রিজিক খেয়ে এবং তাঁরই দৃষ্টির মধ্যে থেকে গোনাহমুক্ত জীবন যাপনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমরা যদি উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে আমাদের মাধ্যমে জীবনে কখনো পাপ কাজ সংগঠিত হবে না, কারণ এই ঘটনাটি অনেক সুন্দর শিক্ষা নিয়ে বিষয় রয়েছে যা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে ইহকালীন শান্তি পরকালীন মুক্তি লাভের আশা করা যায়, বস্তুত পাপ কাজের মধ্যে কোন শান্তি নেই বরং অশান্তি আর অশান্তি বিরাজ করছে।

০৩- হিংসা করা,মানুষের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক হলো হিংসা ও অহংকার। হিংসা এবং অহংকার মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনকে করে তুলে বিষময়।

আমাদের মনে রাখতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ একটি মারাত্মক ব্যাধি। হিংসুক ব্যক্তি যখন হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক হলো

হিংসা ও অহংকার। হিংসা এবং অহংকার মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনকে করে তুলে বিষময়।

আমরা ইতিহাসে পাতায় দেখতে পাই হিংসার ঘটনাবলী, যেমন আদম আলাই সাল্লাম এর দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল তারা কিন্তু দুই ভাই এক অপরকে হত্যা করেছিল হিংসাত্মক হয়ে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে, এই হচ্ছে পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম হত্যাকা-। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অপরাধ। প্রথম এই হত্যাকারে পেছনের কারণও আমরা কুরআনের আয়াতসমূহে দেখতে পাই, 'তোমার কুরবানী কবুল হয়েছে আর আমারটি হয়নি এই চিন্তা থেকেই কাবীলের মনে হিংসা জমাট বাঁধতে থাকে আর এর পরিণতিতেই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে। যে হিংসা মানুষকে দিয়ে পৃথিবীতে পাপের সূচনা করাল, সে-ই হিংসা জগতে আরও কত শত-শত অনিষ্ট ঘটিয়েছে তার হিসাব কে জানে!

★ ইতিহাসের আরও পেছনের পাতায় আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইবলিসের যে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে তার অভিশপ্ত হওয়ার কথা, তার মূলেও তো একই হিংসা। কুরআনের ভাষায়

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ.

সে বলল, দেখুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছেন? সূরা ইসরা (১৭) : ৬২

ফলাফল তো এই আকাশের প্রথম অপরাধ আর জমিনের প্রথম অপরাধ সবটার মূলেই এই হিংসা। এর জঘন্যতা তাই আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

★ প্রশ্ন হল, হিংসা কী? হিংসা হচ্ছে অন্যের ভালো কোনো কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা।

হিংসা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে করে তুলে দুর্বিষহ ও বিষময়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا - سُورَةُ الإِسْرَاءِ: ٣٧]

আল্লাহর জমিনে তোমরা দম্ভ ভরে চলো না, কেননা তুমি কখনই এ জমিন বিদীর্ণ করে এর নিচে যেতে পারবে না, আর উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বতসমানও হতে পারবে না।

(সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৭)।

সুরা হুজরাতের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ - سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ١١

হে ইমানদারগণ, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়েও উত্তম।আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়েও উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা কতই না নিকৃষ্ট। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা জালেম।

হিংসুটেকে সমাজে কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। সমাজে সবার সঙ্গে বসবাস করলেও কেউ তাকে ভালো জানে না। মানুষ কেন একজন আরেকজনকে হিংসা করে? সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তা হলো- পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, দাম্ভিকতা, একে অপরকে ঈর্ষা করা, নেতৃত্ব পাওয়া, নিজেকে যোগ্য ভাবা, ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল করা, ক্ষমতা পাওয়া ইত্যাদি।এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিংসা-বিদ্বেষ

থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র কোরআনে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

সুরা ফালাকের ৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -سُورَةُ الفَلَقِ: ٥

'হিংসুক ব্যক্তির হিংসার অনিষ্ট থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা করে।

★হিংসুকের চিহ্নসমূহ :

★ قال لُقمان (ع) لابنه: و للحاسد ثلاثُ علاماتٍ: يغتبُ إذا غابَ وَ يَتملّقُ إذا شهَدَ وَ يَشمَتُ بَالمُصيبةِ.

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বললেন : 'হিংসুকের তিনটি চিহ্ন রয়েছে : পিঠ-পিছনে গীবতকরে, সামনা সামনি তোষামোদ করে এবং অন্যের বিপদে আনন্দিত হয়।' (আল খেসাল, পৃষ্ঠা ১২১, হাদীস নং ১১৩)

*হিংসার ব্যাপারে কবি বলেন: (আরবী ভাষার উক্তি),,,

الحاسد يحترق بنار الحسد.

অর্থাৎ হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলে। কারণ হিংসা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যাকে এগিয়ে যেতে দেখে কেউ হিংসা করছে, সে তো এগিয়েই যায়। হিংসা তার এগিয়ে চলার গতি রোধ করতে পারে না। কারও মনে সৃষ্ট হিংসা যদি অন্য কারও নিআমতকে বিনাশ করতে পারত, তাহলে তো জগতের কেউই ভালো কিছু হাছিল করতে পারত না। দাঁড়াতে পারত না কারও সম্মান প্রতিপত্তি সুনাম যশ খ্যাতি সুসন্তান অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বীনদারী পরহেজগারি কিছুই। কথায় বলে না।শকুনের দুআয় গরু মরে না! আত্মচিন্তায় বিভোর শকুনের কামনা যেমন গরুর মৃত্যু ডেকে আনে না, তেমনি হিংসুকের হিংসাও কারও নিআমত ছিনিয়ে নিতে

পারে না। হিংসাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিনিয়ত যখন কেউ এগিয়ে চলে তখন বাড়তে থাকে হিংসার আগুন। সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে হিংসুকের অন্তর। কথা হল, হিংসার আগুন কি শুধু হিংসুকের অন্তরকেই জ্বালায়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা এর উত্তর পাই,

إِيّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। কারণ হিংসা নেক আমলসমূহকে গ্রাস করে নেয়, যেভাবে আগুন গ্রাস করে লাকড়ি (অথবা ঘাস)। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৫)

শুকনো ঘাস আর লাকড়ি যেমন আগুনের সামনে অসহায়, হিংসার আগুনের সামনে মানুষের নেক আমলও তেমনি অসহায়। হিংসার আগুন গ্রাস করে নেয় ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদীসে হিংসাকে তুলনা করেছেন পানির সঙ্গে। দুই হাদীসের দুই উপমা বাহ্যত বিপরীতমুখী মনে হলেও এ বিবেচনায় তো অবশ্যই এক—আগুন যেমন লাকড়ি আর ঘাসকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়, পানিও তেমনি আগুনকে নিভিয়ে দেয় মুহূর্তেই। আগুনের সামনে লাকড়ি আর ঘাসের প্রাচুর্য যেমন কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, পানির সামনেও আগুনের বিশালতা উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। হাদীসের ভাষ্য এমন,

إِنّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ.

সন্দেহ নেই, হিংসা নেক আমলসমূহের নূর ও আলোকে নিভিয়ে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৬)

হিংসা তাই সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। এ হিংসা কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না। হাদীসের বক্তব্য এমনই

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.

কোনো বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।(সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩১০৯)

আরেকটি হাদীসে তাঁর নির্দেশনা এমন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، رواه البخاري-

সাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।

ইসলাম অন্যের প্রতি হিংসা করা বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের স্থলে সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেছেন,

أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمًا - سُورَةُ النِّسَاءِ: ٥٤

'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্য কি তারা তাদের ঈর্ষা করে?' (সূরা আন-নিসা,আয়াত: ৫৪

মনকে হিংসামুক্ত রাখার জন্যে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুআটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِى وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِى وَثَبِّتْ حُجَّتِى وَاهْدِ قَلْبِى وَسَدِّدْ لِسَانِى وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِى.

প্রভু আমার! আপনি আমার তওবা কবুল করুন, আমার পাপরাশি ধুয়ে দিন, আমার ডাকে সাড়া দিন, আমার দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করুন, আমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার যবানকে সঠিক রাখুন আর আপনি আমার অন্তরের যাবতীয় কলুষতা দূর করে দিন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১২)

আমরা এক কথায় বলতে পারি হিংসা করার মধ্যে কোন শান্তি নিহিত নেই তার মধ্যে শুধু অশান্তি আর অশান্তি বিরাজ করছে,

অতএব,একজন মুসলিমের কর্তব্য হ'ল সর্বদা সাদা মনের অধিকারী থাকা। তার অন্তরে যেন কারো প্রতি হিংসার কালিমা না থাকে। যদি কোন কারণ বশতঃ সেটা কখনো এসেই যায়, তবে বুদ্বুদের মত যেন তা উবে যায়। কচুর পাতার পানির মত যেন তা ঝরে যায়। হৃদয় যেন সকলের প্রতি উদার থাকে এবং শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি হেদায়াতের আকাংখী থাকে। এমন অবস্থায় নিদ্রা যাবে, যেন তার হৃদয়ের কোণে কারু প্রতি হিংসার কালো মেঘ জমে না থাকে। কেননা এই নিদ্রা তার চিরনিদ্রা হ'তে পারে।

ভালোবাসা ও বিদ্বেষের মানদন্ড হবে কেবল ঈমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্ত্ত ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।

সুতরাং আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হলে ধর্মপ্রাণ মানুষকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে সুন্দর মনমানসিকতায় সৎভাবে পরিশীলিত জীবনযাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

০৪- রাগ করা যাবে না,দুনিয়াতে বহু অনিষ্টের কারণ হলো রাগ বা ক্রোধ। মানুষ এ রাগের বশবতী হয়ে অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কাজ করে ফেলে। এ রাগের ফলে মানুষ সম্মানিত হওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অবজ্ঞার শিকার হয়। তাই কারো দ্বারা কোনো ক্ষতি বা অন্যায়মূলক কাজ হয়ে গেলেও রাগ না করে ক্ষমা করা বা ধৈর্য ধারণ করা। কারণ রাগ নয় ক্ষমায় রয়েছে মুমিনের সাফল্য।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমা প্রদর্শনে রয়েছে ইসলামের অনেক নির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি লোকদের প্রশংসা করে বলেন,

وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمۡ يَغۡفِرُونَ – سُورَةُ الشُّورَىٰ: ٣٧

‘যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সুরা শুরা : আয়াত ৩৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন বলেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ – سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٣٤

‘যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা রাগ সংবরণকারী আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ নেককারদেরকে ভালবাসেন। (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৩৪)

রাগের পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়াকে সফলতা বলার অন্যতম কারণ হলো, ‘স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে কোনো অন্যায় বা ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেয়া সহজ ব্যাপার। কিন্তু রাগের সময় সামান্য বিষয়ে ক্ষমা করাও কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ হলো এ কঠিন মুহূর্তেও নিজেকে সংবরণ করে ক্ষমা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب – متفق عليه

‘ওই ব্যক্তি বীর পুরুষ নয়; যে অন্যকে ধরাশায়ী করে দেয়। বরং রাগের সময় যে ব্যক্তি নিজের রাগ সংবরণকারী, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর (পুরুষ)।’ (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

রাগের সময় করণীয় কুরআন ও হাদিসের আলোকে রাগ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদিসটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, রাগ বা ক্রোধ শয়তানের তরফ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে দেয়। যদি কারো ক্রোধ বা রাগ আসে তবে তার উচিত ওজু করে নেয়া।’ (বুখারি, মিশকাত)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, রাগ মানুষের আমলকে নষ্ট করে দেয়; অকারণে রাগ করলে মানুষের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রিয়নবির ঘোষণায়, ‘ক্রোধ বা রাগ মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে দেয়। (বয়হাকি, মিশকাত)
বাংলাতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে, ‘রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন’। প্রচলিত বাক্যটি অনেকেই জানেন। আসল কথা হলো- রাগ স্বাস্থ্যপ্রদ একটি স্বাভাবিক আবেগ। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বা রাগের বিস্ফোরণ ঘটলে, এর গুরুতর পরিণতি হতে পারে। এটা পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থা— সবকিছুর ক্ষেত্রেই।
স্বাভাবিকতই ইসলাম রাগকে একটি মানবীয় ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করেছে। পাশাপাশি রাগ সংবরণ ও দমনে নানা রকম নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বলল,

‘আমাকে উপদেশ দিন, হে আল্লাহর রাসুল।’ তিনি বললেন, ‘রাগ কোরো না।’ রাসুল (সা.) ‘রাগ কোরো না।’— কথাটি কয়েকবার বলেছেন। (বুখারি, হাদিস : ৬১১৬)

রাগের অনুভূতিটি হয়তো সমস্যা নয়। কিন্তু কীভাবে রাগ সামলানো যায়— সেটিই গুরুত্বপূর্ণ কথা।

রাগ দমনের কিছু পদ্ধতি কুরআন- হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

★ **অধিক হারে আল্লাহ্‌র যিকির করা:** যেমন কুরআন পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি করা। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন যে, একমাত্র তাঁর যিকিরই অন্তরে প্রশান্তি আনতে পারে। তিনি বলেন,

{ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } [سُورَةُ الرَّعْدِ: ٢٨]

“জেনে রাখ আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।” [সূরা রা’দঃ ২৮]

★ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

রাসুল (সা.)-এর কাছে বসে দুই ব্যক্তি পরস্পর কটু বাক্যালাপ করছিল। ফলে একজনের চোখ লাল হয়ে উঠে এবং গলার শিরা ফুলে যায়। তখন রাসুল (সা.) বললেন—

‘আমি একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তবে তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো, (আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম) আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৮১২)

★ক্রুদ্ধ অবস্থায় চুপ থাকা।
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৪৭৮৬)

★ শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন।
রাসুল (সা.) হাদিসে বলেন—
যখন তোমাদের কেউ রাগ করে, তখন সে দাঁড়ানো থাকলে, সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ চলে যায় ভালো। না হয়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।
(সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৪)

★ অজু করা। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়, সে যেন অজু করে।' (সুনানে আবি দাউদ : ৪৭৮৬)
এক কথায় বুঝা গেল যে, রাগ করার মাধ্যমে মানুষের অশান্তি হয়েছে এতে কোন শান্তি নেই অতএব আমরা রাগ বেঁচে থাকব এটি আমাদের কাম্য,
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাগী হওয়া থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক, আমীন,,

০৫ – জুলুম,অত্যাচার,নির্যাতন করা।

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর যত সৃষ্টি রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ, যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সম্বলিত গ্রন্থ 'কুরআনুল কারিম' নাযিল করেছেন। তাদের প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহিতার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করেছেন। পরকালীন জীবনে কোনো আদম সন্তানই জবাবদিহিতা ছাড়া এক কদমও নাড়াতে পারবে না বলে সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসুল (সা.) বলেছেন: তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না।

০১- ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া। ০২- ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া।

০৩- মজলুমের দোয়া।

আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া মেঘমালার ওপরে তুলে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেন। মহান রব বলেন, আমার সম্মানের শপথ, কিছুটা বিলম্ব হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব। (তিরমিজি : ৩৫৯৮)

তাই মানুষের সঙ্গে কারণে হোক আর অকারণে, কোনোভাবেই অন্যায় আচরণ, জুলুম-অত্যাচার করা যাবে না। মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। এ কারণেই অত্যাচারিত ব্যক্তির আবেদন-নিবেদন আল্লাহ তাআলার দরবারে সরাসরি পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার মাজলুমের চাওয়া-পাওয়া খুবই দ্রুততার সঙ্গে কবুল করে

থাকেন। সুতরাং মানুষের উচিত, দুনিয়ার কোনো সৃষ্টির প্রতিই জুলুম অত্যাচার না করা।

অত্যাচার একটি ভয়াবহ পাপ, জুলুমের অর্থ হলো- অত্যাচার, নির্যাতন, অবিচার। সাধারণ অর্থে কাউকে অন্যায়ভাবে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা যেকোনো পন্থায় নির্যাতন করাকে জুলুম বলে। (অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম জুলুম।)জুলুমের সবচেয়ে উত্তম সংজ্ঞা হলো, কোনো কিছু নিজ স্থান বাদ দিয়ে অন্য কোনো স্থানে প্রয়োগ করা।

জুলুম একটি সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এটি। অন্যের ওপর অবিচার করে নিজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে অত্যাচারীরা। আপদ-বিপদ ও দুর্যোগ-বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ জুলুম। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে জুলুম থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। এমনকি আল্লাহ নিজের জন্যও এটিকে হারাম করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর কথা বর্ণনা করে বলেন,

يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا

‘হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।’ –সহিহ মুসলিম: ৬৭৩৭

এটা স্পষ্ট যে, জুলুম একটি ভয়াবহ পাপ। যে পাপ আল্লাহতায়ালা সহজে ক্ষমা করবেন না। কেউ যদি কাউকে জুলুম করে নিপীড়িতের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অন্যথায় মাফ হবে না। কিয়ামতের ময়দানে প্রতিটি অপকর্মের জন্য কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। যে সমাজে অধিক পরিমাণে জুলুম বিদ্যমান, সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না। বরং বিভিন্ন আজাব-গজবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

★ ইসলামি স্কলারদের মতে, সমাজে বিরাজমান অত্যাচার-অনাচার ও বিশৃঙ্খলা-অস্থিরতার মূল কারণ হলো- জুলুম। একে অপরের উপর নানা রকম অবিচারের ফলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর এ বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কুরআনে কারীমে বলেছেন,

{ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ }
[سُورَةُ الرُّومِ: ٤١]

'জল ও স্থলভাগে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা মানুষের কর্মের ফলস্বরূপ। (সূরা আর রুম: ৪১)

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম নর-নারীকে সতর্ক করে বলেছেন, 'তোমরা কারও প্রতি জুলুম করো না।'কারণ 'আল্লাহ তায়ালা জুলুমকারীদের হেদায়েত দেন না। এবং জালেমকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

সাহাবী জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিজ রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তা হচ্ছে-

১. দুর্বলের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।

২. মা-বাবার প্রতি উত্তম ব্যবহার করা।

৩. অধীনস্থদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জুলুমের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

{ وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ } [سُورَةُ الشُّعَرَاءِ: ٢٢٧]

'অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে।' (সুরা আশ শু'আরা : ২২৭) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَلَقَدۡ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُواْۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ } [سُورَةُ يُونُسَ: ١٣]

অবশ্যই আমি তোমাদের আগে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুমে লিপ্ত ছিল' (সূরা ইউনুস:১৩)।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে আর ছুটে যেতে পারে না' (বায়হাকি-৬/৯৪; বুখারি-৪৬৮৬; মুসলিম-২৫৮৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام:21]

'জালিমরা কখনো সফল হয় না।' (সুরা আল আন'আম : 21)

জুলুম ব্যক্তির জন্য কিয়ামত দিবসে বিরুদ্ধ সাক্ষী হবে। হাদিসে এসেছে,

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ،

'জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার রূপ নেবে' (সহিহ বুখারি-২৪৪৭; মুসলিম-৬৭৪১)। রাসূল সা: বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে

অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন' (মুসলিম-২৬১৩)।

জুলুমের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। জুলুম এমন একটি অন্যায় কাজ, যার শাস্তি আল্লাহ তা'আলা ইহকালেও দিয়ে থাকেন। জালিমের বিচার শুধু কিয়ামতের দিবসেই হবে না, বরং দুনিয়া থেকেই আল্লাহ তাআলা তাদের জুলুমের প্রতিদান দেওয়া শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুটি পাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ায়ও দিয়ে থাকেন। তা হলো, জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি।' (তিরমিজি : ২৫১১)

রাসুল (সা.) আরো বলেন, 'তোমরা মজলুমের দোয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেননা মহান আল্লাহ ও তার দোয়ার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।' (বুখারি : ১৪৯৬)

আমাদের মনে রাখা দরকার, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন এমন এক অপরাধ যা সাধারণত আল্লাহ মাফ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মজলুম ব্যক্তি (যার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে) জালেমকে (অত্যাচারী ব্যক্তিকে) মাফ না করেন।
তাই, অন্যের প্রতি জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে; জালিম সম্প্রদায়কে সহযোগিতা নয় বরং জালিমকে প্রতিহত করে মাজলুমকে রক্ষা করা হবে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব।

ইসলামে জুলুম বড় অন্যায় বলে বিবেচিত। ইসলাম সব সময় জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইসলাম বলেছে, আল্লাহর হক আদায় না

করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেও বান্দার হক বিনষ্টকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না যার ওপর জুলুম করা হয়েছে সে ক্ষমা করে দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জুলুম-নির্যাতন এতো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, যার প্রতিকার এখনিই করা উচিত। এ জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের একসাথে রুখে দাঁড়াতে হবে।

মূলত জুলুম-নির্যাতন অত্যাচারের মধ্যে কোন শান্তি নিহিত নেয় শুধু তার মধ্যে অশান্তি আর অশান্তি আর অশান্তি,

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা সেই তৌফিক দান করুক আমাদেরকে আমিন,

০৬- নেশা করা, মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ অঘটনের মূল ও অশান্তির কারণও বটে।

মানবজীবনে শান্তি ও মুক্তির জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির অনুকূল আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা। ঈমান মানে বিশ্বাস ও নিরাপত্তা এবং সমাজের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া। ইসলামী শরিয়তের সব বিধান এই আলোকেই সুবিন্যস্ত।

মাদক হলো নেশা উদ্রেককারী সব বস্তু, যা মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দেয়, যার প্রভাবে মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করে না। ইসলামি নীতিমালাগুলো সৃষ্টির সুরক্ষার অনুকূলেই নাজিল হয়েছে। শরিয়তের বিধানের উদ্দেশ্যসমূহকে ‘মাকাসিদে শরিয়া’ বলা হয়।

(মাকাসিদুশ শারিয়াহ) শরিয়তের উদ্দেশ্য হলো পাঁচটি।

০১-জীবন রক্ষা,

০২- সম্পদ রক্ষা,

০৩- জ্ঞান রক্ষা,

০৪- বংশ রক্ষা,

০৫- বিশ্বাস বা ধর্ম রক্ষা।

হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান রাখা হয়েছে জীবন সুরক্ষার জন্য। সেখানেও রয়েছে দিয়াত বা রক্তপণ দিয়ে নিহতের অভিভাবকের কাছ থেকে ক্ষমার সুযোগ। চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান আছে সম্পদ সুরক্ষার জন্য। এখানেও রয়েছে অপেশাদার অভাবীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ও ক্ষমার সুযোগ। সব ধরনের মাদক বা নেশাদ্রব্য হারাম করা হয়েছে জ্ঞান বা বুদ্ধি–বিবেক সুরক্ষার জন্য। মাদক গ্রহণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা রয়েছে।

যে বস্তু ব্যবহারে নেশার উদ্রেক হয়, মানুষের মস্তিষ্ক বিকল হয়, স্বাভাবিক জ্ঞান ঠিকভাবে কাজ করে না; সেসব বস্তুই মাদক। মানবতার সুরক্ষার জন্য ইসলামে মাদক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, অপবিত্র ও হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

{ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٩٠]

‘হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।‘ (সুরা মায়েদা : আয়াত ৯০)

জগতের সব অপরাধের সঙ্গে তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্ট, যথা অবৈধ অর্থসম্পদ, মাদক ও অবৈধ নারীসঙ্গ। মানবসভ্যতা ধ্বংসের পেছনেও এই তিন কারণ বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

{ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ)
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢١٩]

‘(হে রাসুল সা.) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহা পাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২১৯)।
এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মাদক গ্রহণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (ইবনে মাজাহ)।
ইসলামের মৌলিক পাঁচটি নিষিদ্ধ বস্তুর অন্যতম হলো নেশা বা মাদকদ্রব্য, জুয়া তথা অসৎ উপার্জন ও অবৈধ নারীসঙ্গ। কিছু অপরাধ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে; ইচ্ছা করলে তা ছাড়া যায়। মাদকের নেশা, জুয়ার নেশা ও অবৈধ নারীসঙ্গের আকর্ষণ এমন অপরাধ, যা নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না; সে নিজেই এসবের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে চাইলেই সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে না; অপরাধী অপরাধকে ছাড়তে চাইলেও অপরাধ অপরাধীকে ছাড়ে না, অপরাধ জগৎ থেকে অপরাধী বের হয়ে আসতে পারে না।

মাদক, জুয়া ও ব্যভিচার অপরাধের আকর, যাতে চক্রবৃদ্ধি হারে অপরাধের শৃঙ্খল তৈরি হয়। কোরআন কারিমে বর্ণিত হারুত ও মারুত এই
মাদকের নেশায়, অবৈধ অর্থের লোভে ও অবৈধ নারীসঙ্গ পাওয়ার মোহে অন্ধ ও মাতাল হয়েই খুনখারাবিসহ নানা অপরাধের জালে আবদ্ধ হয়ে পাপের শিকলে শৃঙ্খলিত হয়েছিল। (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১০২; তাফসিরে আজিজি ও মাআরিফুল কোরআন)।

মাদক বিষয়ে নবী (সা.)-এর অসংখ্য বাণী রয়েছে। সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, রাসুল (সা.) মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০

ধরনের লোককে অভিসম্পাত করেছেন। তারা হলো : মদ প্রস্তুতকারী, পরামর্শদাতা, পানকারী, বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, মূল্যভোগী, ক্রেতা এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।' (জামে তিরমিজি)।

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মর্মে অসিয়ত করেন:

«لاَ تَشْرَبِ الْـخَمْرَ؛ فَإِنَّـهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»

"(কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি"।

★ একদা বনী ইসরাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোনো একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলো: মদ্যপান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শূকরের গোশত খাওয়া। এমনকি তাকে এর কোনো না কোনো একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো।

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক দ্রব্যকেই 'খামর' বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভুক্ত। আর মদ বলতেই তো সবই হারাম।

সাহাবি হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হলো ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞানতার

বিস্তার ঘটবে, মদ্যপান ও মাদকের প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে’ (বুখারি, প্রথম খণ্ড, হাদিস: ৮০)। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে মিরাজের রাতে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেখানো হয়েছে। ‘তিনি মদ, মাদক ও নেশা গ্রহণকারীদের শাস্তি দেখলেন। তারা জাহান্নামিদের শরীর থেকে নির্গত বিষাক্ত নোংরা পুঁজ পান করছে’ (বুখারি ও মুসলিম, মিরাজ অধ্যায়)।

ফিকাহ তথা ইসলামি ব্যবহারিক বিধানমতে মাদক গ্রহণ হারাম হওয়ার পাশাপাশি তা অপবিত্রও। কোনো মুসলমানের মাদক ব্যবহার করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা এবং ক্রয়–বিক্রয় করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

নবী সাঃ বলেছেন,আমার উম্মতের একদল লোক মদ পান করবে তারা মদকে অন্য পানীয়ের নামে নাম পরিবর্তন করে পান করবে। নেতাদের গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সম্মান দেখানো হবে। যখন এ দিন আসবে তখন ভূমিধস, বানর, শূকরের মতো আকৃতি বিকৃতি হবে (বুখারি-ইবনে মাজাহ)

বর্তমানে প্রচলিত নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হলো হেরোইন, ফেনসিডিল, মরফিন, পেথেড্রিন, এলএসডি, সিসা, কোকেন, গাঁজা, তাড়ি, নানা ব্র্যান্ডের দেশি-বিদেশি মদ, আফিম, ইয়াবা, মারিজুয়ানা, রেকটিফাইড স্পিরিট, আইকা, গাম ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ; যার দ্বারা যুব-তরুণ সমাজ নেশায় আসক্ত হচ্ছে। এই নেশাজাত দ্রব্য পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক এসব নেশাদায়ক দ্রব্যসহ আরও যেসব জিনিস গ্রহণ করলে মানুষ নেশায় আসক্ত হয়, তা গ্রহণ করা

হারাম। এতে কবিরা গুনাহ হয়। যার গুনাহ খালেছ নিয়তে তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

বর্তমানে তাই হচ্ছে মদের নাম পরিবর্তন করে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করছে সেই জিনিসগুলোকে, অথচ মদ জুয়াগুলো মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই শান্তি নেই অশান্তির কারণে এগুলো আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে এইরকম অশান্তির জিনিসগুলো থেকে থাকার রাখার তৌফিক দান করুন আমীন,,

০৭ - খারাপ ধারণা পোষন করা। মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদতের সমতুল্য। কারো প্রতি কখনো খারাপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়।অন্যান্য মহৎ গুণের পাশাপাশি একজন মুসলিমকে যে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে তা হ’ল মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। সুধারণা সমাজে কল্যাণ বয়ে আনে, ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখে। সুচিন্তা-সুধারণা আমাদেরকে বিবেকবান উন্নত মানুষে পরিণত করে। প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই সুধারণামূলক মনোভাব থাকা আবশ্যক। কেননা অপরের উপর ভাল ধারণা পোষণ করা নেকীতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

‘সুন্দর ধারণা সুন্দর ইবাদতের অংশ’।

পক্ষান্তরে কুধারণা মোটেও কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনতে পারে না। মন্দ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ-কলহে ও অশান্তির ইন্ধন যোগায়। নানান অন্যায়-অসার কথাবার্তার বিস্তার ঘটায় মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে মানব মনে অসন্তোষের দানা বাঁধতে শুরু করে মন্দ ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধে চিড় ধরে ফলে একতার বন্ধন ভেঙ্গে

টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এজন্যই অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে সদা-সর্বদা সুধারণা পোষণ করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালবাসে? বস্ততঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ তওবা কবুলকারী, কৃপাণিধান' (হুজুরাত:১২)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, 'কোরআনে যে অনুমান করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে অন্যের সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও অপবাদ দেওয়া যে মন্দ বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই, সে বিষয়ে কেবলই অনুমানের ওপর ভর করে কিছু বলে দেওয়াকেই এ আয়াতে বারণ করা হয়েছে যেমন, কাউকে কোনো অশ্লীল বিষয়ে কিংবা মদ্যপানে অভিযুক্ত করা '।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অনুমান থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়ার পর আল্লাহতায়ালা এর কারণ বলে দিয়েছেন এভাবে- কিছু কিছু অনুমান গোনাহের কারণ হয়। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, মন্দ ধারণা ও অনুমানই গিবত-পরনিন্দা-মিথ্যা অপবাদের মতো জঘন্য গোনাহের পথ করে দেয়।

কারো সম্পর্কে যদি স্পষ্টভাবে জানা যায়, সে কোনো পাপকাজে জড়িয়ে পড়েছে কিন্তু সে ব্যক্তি তা প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ করাকে সে পছন্দও করছে না, তাহলে সে পাপের কথা বলে বেড়ানোই তো মৃত ভায়ের মাংস খাওয়ার মতো অপরাধ! এ থেকেই বোঝা যায়, যদি কারো দোষ বলাটা শুধুই ধারণানির্ভর হয় তাহলে তা কত ঘৃণিত কাজ হবে!
মন্দ ধারণা ও অতিরিক্ত ধারণা থেকেই হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি আর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্যায়ের জন্ম অনেক ক্ষেত্রে আমরা সুধারণার পরিবর্তে কুধারণাকে প্রাধান্য দিতে পসন্দ করি অপর মুসলিম ভাইয়ের মানহানি করি, তার মানমর্যাদা নিয়ে টানাহেঁচড়া করি অথচ এগুলো অমানবোচিত কাজ হাদীছে সংশয়-সন্দেহ থেকে দূরে থেকে পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে বলা হয়েছে মিথ্যা ও অনুমান ভিত্তিক বাগাড়ম্বর, বাকপটুতা তো দূরের কথা, অন্তরে মন্দ ধারণার বশবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، لاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا '

তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক কারণ, ধারণা ভিত্তিক কথাই হ'ল সবচেয়ে বড় মিথ্যাকথা,তোমরা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান কর না ,পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কর না এবং পরস্পর দুশমনি কর না, বরং তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও হে আল্লাহর বান্দারা'

★ ধারণার প্রকারভেদ : আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) ধারণাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : যেমন-

১. সুধারণা।

২. কুধারণা ও

৩. বৈধ ধারণা ।

১. সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব : তা হ'ল আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে , অনুরূপভাবে মুমিনদের প্রতি অপরাপর মুমিনদের সুধারণা পোষণ করাও ওয়াজিব ।

২. কুধারণা করা হারাম : আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং মুসলিমদের বাহ্যিক কাজকর্মের উপর কুধারণা বা মন্দ ধারণা পোষণ করা হরাম , রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক'।

৩. বৈধ ধারণা : যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম সম্পাদনে অত্যধিক পটু, তার মন্দ কাজ-কর্ম প্রকাশ্যে ধরা পড়ে ও মানুষের নিকট মন্দ বলেই সে পরিচিত; এরূপ মানুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হারাম নয়, বরং বৈধ ছালাতে কারো যদি এই সন্দেহ হয় যে, সে কি তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত? তবে সন্দেহ অবসানের লক্ষ্যে কম সংখ্যক রাক'আতের উপর অনুমান করে, বাকী ছালাত পূর্ণ করে ছালাত শেষে সাহু সিজদা দিবে । এই প্রকারের ধারণা ইসলামে বৈধ

সুতরাং মানুষের প্রতি কখনো কোনো খারাপ ধারণা পোষণ নয়, বরং সবার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করে সওয়াব ও কল্যাণের অধিকারী হওয়া জরুরি । সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে

পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণের বিকল্প নেই । অযথা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের মাধ্যমে তার চরিত্র হনন থেকে বিরত থাকাও জরুরি । কারণ, এতে রয়েছে মারাত্মক গোনাহ
পরিশেষে বলা যায় যে, সুধারণা পোষণ উন্নত চরিত্রের ভূষণ অন্যের সম্পর্কে সুধারণার ফলে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান পুরোপুরিভাবে সম্ভব । ফলে সমাজের দ্বন্দ্বকলহ নিঃশেষ হয়ে সমাজের মানুষের ভ্রতৃত্ববোধ অটুট হবে দৃঢ় হবে সামাজিক মেলবন্ধনের সেতু , তাই অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ ধারণা রেখে আমরা সমাজে বসবাস করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে অপর মুসলিম সম্পর্কে সুধারণা পোষণের ‘ক্বালবে সালীম’ তথা সুস্থ অন্তঃকরণ দান করুন-আমীন!

০৮ - কুলক্ষণ মনে করা,

অশুভ ও কুলক্ষণ এবং কোনো বিষয়ে ধারণা পোষণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি ছোট শিরক। এর উদাহরণ এরূপ যে,আরবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারের নাম ছিল তিয়ারা। আরবরা বাণিজ্যে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে বের হওয়ার আগে পাখি উড়াত। পাখিটি উড়ে ডান দিকে গেলে তারা যাত্রাকে শুভ মনে করত আর বাম দিকে গেলে অশুভ মনে করত।

এই মর্মে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*অতঃপর যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসতো, তখন তারা বলতো এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যদি তাদের নিকট অকল্যাণ এসে উপস্থিত হতো, তখন তা মূসা এবং তার সঙ্গীদের অশুভ কারণরূপে মনে করতো। শুনে রাখো! তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহ্‌র কাছেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। (সূরা আরাফঃ ১৩১)
অর্থাৎ তাদের কাছে কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর ভালমন্দ যা কিছু জোটে তা ভাগ্যের কারণে।
এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
*রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা ইয়াসিনঃ ১৯)

★অন্ধকার যুগের মতো বর্তমানেও আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়। যেমন, হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে মনে করা হয় মেহমান আসবে। কোনো আলোচনার সময় টিকটিকি ডাকলে মনে করা হয় আলোচনাটি সঠিক। রাতে বাড়িতে কাক ডাকলে মনে করা হয় বাড়ির কেউ মারা যাবে। বাড়িতে নতুন বউ আসার পর কেউ মারা গেলে, কারও কঠিন পীড়া হলে বা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে মনে করা হয় এ বউ সাংঘাতিক কুলক্ষণে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পেছন থেকে ডাক

দিলে কুলক্ষণ মনে করা হয়। কার্তিক মাসকে বিয়ের জন্য অশুভ মনে করা হয়।

মাস, দিন, সংখ্যা, নাম ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করাও তাওহীদ পরিপন্থ হারাম আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অনেক দেশে হিজরী সনের ছফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা হয় ও প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে চিরস্থায়ী কুলক্ষণ মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ১৩ সংখ্যাকে 'অলুক্ষণে তের unlucky thirteen বলা হয়। কেউ যদি তের ক্রমিকে একবার পড়ে যায় তাহলে তার আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। অনেকে কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দোকান খুলতে গিয়ে পথে এমনিতর কোনো কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অশুভ মনে করে সে ফিরে আসে। অথচ এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা হারাম ও শির্ক। এজন্য যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন নি। ইমরান ইবন হুছাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلَا تَكَهَّنَ وَلَا تُكُهِّنَ لَهُ» «أَظُنُّهُ قَالَ»: أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»

*যে ব্যক্তি নিজে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে ও যার কারণে অন্যের মাঝে কুলক্ষণের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে ও যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কেও বলেছিলেন) এবং যে জাদু করে ও যার কারণে জাদু করা হয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।

এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الطِّيَرَةُ شِرْكٌ»

*কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক।

কেউ কোনো বিষয়ে কুলক্ষণে নিপতিত হলে তাকে এজন্য কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা এখানে কোনো অর্থ কিংবা ইবাদত নয়; বরং পাপ বিমোচক একটি দোআ, যা আব্দুল্লাহ ইবন আমর বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, কুলক্ষণ যে ব্যক্তিকে কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয় সে শির্ক করে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুলাল্লাহ! তার কাফফারা কী হবে? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি বলবে:

«اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আপনার সৃষ্ট কুলক্ষণ ছাড়া কোনো কুলক্ষণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোনো (হক) মাবুদও নেই ।

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেওয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে বাড়ে ও কমে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আল্লাহর ওপর

তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। যেমন, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

«وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তা দূর করে দেন ।

* ইসলামে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। আবু দাউদের এক হাদিসে নবী করিম (সা.) আমাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَعنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرٍ قَالَ: ذُكِرتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَألُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإذا رَأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَه فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لا يَأْتي بالحَسَناتِ إلا أَنتَ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلا أَنْتَ، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِكَ حديثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ أبو داود بإسْنادٍ صَحيحٍ.

উরওয়া ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেনঃ হাঁ, শুভ লক্ষণ হচ্ছে ফা’ল। এমন অশুভ কিছু নেই যা মুসলিমকে কোন কাজে বা কোথাও যাত্রা হতে বিরত রাখতে পারে। তবে তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, অর্থাৎ হে আল্লাহ! কল্যাণদাতা একমাত্র তুমি। অমঙ্গল দূরকারী একমাত্র তুমি। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক কাজ করা সম্ভব নয়।

বায়হাক্বী। সানাদে হাবীব ইবনু আবূ সাবিত রয়েছে। তার ইরসাল ও তাদলীস প্রচুর এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৯১৯

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই এবং পাখি উড়াতে কোন শুভ-অশুভ নেই আর আমার নিকট ‘ফাল পছন্দনীয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘ফাল কী? তিনি বললেনঃ ভাল কথা। মুসলিম ৩৯/৩৪, হাঃ ২২২৪, আহমাদ ১৩৯৫১] সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৭৬

একই হাদিস অন্য সহীহ সূত্রে এসেছে

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ " رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন কুলক্ষণ নেই। তবে তার মাঝে উত্তম হল ফাল তথা শুভ-লক্ষণ। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! ‘ফাল’ কি? তিনি বললেন, (যেমন) এমন কিছু কথা উত্তম, যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়।

(ই.ফা. ৫৬০৪, ই.সে. ৫৬৩৩)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৯১

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এর একমাত্র চিকিৎসা হ’ল আল্লাহর উপর পূর্ণভাবে

তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা তা দূর করে দেয়’ (আবুদাঊদ হা/৩৯১০; মিশকাত হা/৪৫৮৪)।

০৯- অহংকার করা।

কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় অহংকার অনেক বড় গোনাহ। অহংকারের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল দুনিয়ায় প্রথম পাপ। শয়তানের অনুসরণে যে বা যারা অহংকার করবে তারাও বড় গোনাহগার। যা আল্লাহ তাআলা সহ্য করেন না।মানুষের যেসব কাজে কবিরা গোনাহ হয়ে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো অহংকার। বুঝে না বুঝে অনেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অহংকার করে থাকে। অথচ অহংকার পতনের মূল।এই অহংকার হচ্ছে সকল পাপের মূল। একে আরবীতে বলা হয় ‘উম্মুল আমরায-সকল রোগের জননী’। বরং বলা যায়, এ জগতের প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার।

মানুষের একটি মারাত্মক ব্যাধি ‘অহংকার’। অহংকার করে জেনেও কোনো ব্যক্তিই অহংকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। এটি এমন এক মারাত্মক মানসিক ও চারিত্রিক রোগ; যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। অহংকারী ব্যক্তি চরম ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতেও যেতে পারবে না। কিন্তু কেন?

অহংকার কী? অহংকার আরবি ‘কিবরু’র প্রতিশব্দ। হাদিসের পরিভাষায় অহংকার হলো- ‘সত্যকে অস্বীকার করা; মানুষকে হেয় করা।’ নিজেকে

অন্যের তুলনায় বড় জানা এবং অন্যকে তুচ্ছ-নিকৃষ্ট মনে করাই অহংকার।

ইমাম যুবাইদি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ‘অহংকার হলো নিজেকে বড় মনে করা, নিজের ভালো গুণে প্রীত হওয়া, অন্য মানুষকে নীচ ও ছোট মনে করা, যাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া দরকার তাদের চেয়ে নিজকে উঁচু মনে করাই অহংকার।

এর পারিভাষিক অর্থ, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। নিম্নের হাদীসটিতে এর পরিণতি ও ব্যাখ্যা দু’টিই বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ-

‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হৌক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হৌক। জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। ‘অহংকার’ হ’ল ‘সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা’।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ- (الأعراف 40)-

‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা থেকে অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না

ছুঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা পাপীদের বদলা দিয়ে থাকি’ (আ‘রাফ ৭/৪০)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ কুফরী বশে বা অজ্ঞতা বশে বলেননি। বরং ‘অহংকার বশে’ বলেছেন। ফলে অহংকারী কাফেরের জান্নাতে প্রবেশ করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ ছুঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব। কাফের তওবা করে ঈমান আনতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তি জানার পরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি স্বীয় অহংকারের উপরে দৃঢ় থাকে ও এক সময় সে ধ্বংস হয়ে যায়। অহংকার তাই মারাত্মক পাপ। যা অন্য অধিকাংশ পাপের উৎস। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মানুষকে অহংকারের পাপ ও তার ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে সাবধান করেছেন।

অহংকারীর কিছু ধরন। নিজেকে নিরহংকার ভেবে অনেকে মনের অজান্তেও অহংকারী হয়ে ওঠে। আবার অনেক সময় কিছু কথা ও ভাব এভাবে ফুটে ওঠে-

১. সে কিছুই জানে না এমনভাবে চলাফেরা করলেও মনে মনে ভাবে- সে বেশি বা অনেক জানে।
২. যে কোনো বিষয়ে নিজেকে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ জানা।
৩. অন্যকে তুচ্ছ বা চুনোপুঁটি ভাবা।
৪. কাউকে ছোট লোক বা ছোট লোকের বাচ্চা মনে করা।
৫. এখানকার সবার কাছে পরিচিত বলে ভাব নেওয়া।
৬. আমিত্ব ভাব প্রকাশ করা যেমন- আমি না হলে...; আমি না থাকলে...।
৭. এমন বলে ভাব নেওয়া- যা করেছি তা শুধু তোদের জন্য....।

৮. অন্যকে বোকা বা মূর্খ আখ্যায়িত করে বলা- আরে, তার কথা বলেন না! আমি না থাকলে ওর কোনো কিছুই হতো না বা ভাতও জুটতো না... ইত্যাদি।

দুনিয়ায় প্রথম অহংকারী কে? পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম অহংকারী ও দাম্ভিকতা প্রদর্শনকারী হলো- শয়তান। অহংকার করে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ঘোষণা করে। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন-

قَالَ مَا مَنَعَکَ اَلَّا تَسۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتُکَ ؕ قَالَ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡهُ ۚ خَلَقۡتَنِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِیۡنٍ

তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, (আদমকে) সিজদা করছ না; যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি’? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ১২)

অহংকারের কারণেই ইবলিস বিতাড়িত হয়েছিলেন জান্নাত থেকে। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করতে গিয়েও অহংকারের অপরাধে কথা সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

{ قَالَ فَٱهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ } [سُورَةُ الأَعۡرَافِ: ١٣]

‘তুমি এ স্থান থেকে নেমে যাও; এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ১৩)

মানুষ কেন অহংকার করে?

১. যখন শয়তান তাকে কৌশলে গ্রাস করে ফেলে। তখন তার নিজের কথা, কাজ ও কৌশলকে নিখুঁত, নির্ভেজাল ও সর্বোত্তম ভাবতে শুরু করে। অন্যের বিশ্বাস, কথা ও কাজকে সন্দেহ করতে থাকে এবং অন্যের ভুলকে বড় করে ধরে নিজের গৌরবকে ফুটিয়ে তোলে।

২. নিজের বোকামি থাকলে অন্যকেও বোকা মনে করে; যা প্রকান্তরে অহংকার।
৩. নিজের বড় বড় ত্রুটি ঢাকতে অন্যের ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে।
৪. আল্লাহর ভয় কম থাকলে বা না থাকলে অহংকার ঢুকে যায়।
৫. নিজের আশ-পাশে চাটুকার ও অযোগ্য লোক থাকলেও লোকেরা অহংকারী হয়ে যায়।
৬. নিজে যা পাবার যোগ্য তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেলেও মানুষে অহংকারী হয়ে যায়।
৭. নিজের প্রশংসা অন্যের মুখে বেশী করে শুনতে থাকলেও মানুষ অহংকারী হয়ে যায়।
৮. নিজের আত্মসমালোচনা যত কম হয়, অহংকার ততবেশি পেয়ে যায়।
৯. অন্যের মুখে নিজের সমালোচনা শোনার ধৈর্য্য কমে গেলেও আস্তে আস্তে মনে অহংকার ঢুকে পড়ে।
১০. কথা-কাজ-আচরণে বিনয় কমে গেলে অহংকার জায়গা করে নিতে থাকে।

অহংকারের ক্ষতি বা কুফল কী?

অহংকারের ক্ষতি বা কুফল অনেক বেশি। অহংকারী ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে; তাই সে সাধারণত সবার সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা বলাকে নিজের

মর্যাদাহানি মনে করে। যখন মানুষের সামনে যায় বা মেশে; তখন এমনটি কামনা করে যে, মানুষ তাকে সম্মান করুক; মর্যাদা দেওয়া হোক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না মর্মে কোরআনে ঘোষণা এসেছে-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে না। আর জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক; অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ (সুরা লোকমান : আয়াত ১৮)

এরপরও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব। -সূরা আ‘রাফ (৭) : ১৪৬

কিন্তু অহংকারীর পরিণতি জাহান্নাম কেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যার অন্তরে অহংকার আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় এর কারণ ওঠে এসেছে-

১. হাদিসে কুদসিতে এসেছে অহংকার আল্লাহ তাআলা চাদর। এ চাদর ধরে যারা টানাটানি করে আল্লাহ তাআলা তা সহ্য করেন না। অহংকারকারীকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত অহংকারের মতো বড় পাপ না করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ "

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-‘বড়ত্ব আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার ইযার (লুঙ্গি)। কেউ যদি এ দুইটির কোনো একটির ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।’ (মুসলিম, মিশকাত)

যেহেতু অহংকার জান্নাতের অন্তরায় জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তাই মুমিন মুসলমানের অহংকারমুক্ত থাকা জরুরি। হাদিসে এসেছে-‘যার অন্তরে এক যাররা (অণু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (মুসলিম, মিশকাত)

২. অহংকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। হাদিসে এসেছে-
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ – رواه مسلم

‘যার অন্তরে এক যাররা (অনু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (মুসলিম, মিশকাত)

০৩- অহংকার মানুষকে অন্যায় ও অশান্তির দিকে ধাবিত করে। যে কারণে আল্লাহ তাআলা অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।
এ মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

{ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ } [سُورَةُ لُقۡمَانَ: ١٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না(সুরা লোকমান : আয়াত ১৮)

০৪- আল্লাহ তাআলার প্রতি যার বিশ্বাস নেই, পরকালে বিশ্বাস নেই, অহংকার তো কেবল তারাই করতে পারে।

এই মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ
لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ২২-২৩

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত কবিরা গোনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম অহংকারের মতো জঘন্য গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। অহংকার মুক্ত থাকতে এ দোয়াটি বেশি বেশি করা-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের নফসের উপর অত্যাচার করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। (সুরা আরাফ : আয়াত ২৩)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়া ও পরকালে অহংকারের ক্ষতি ও ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১০ – বিদ্বেষ পোষণ করা।

বিদ্বেষ : আমল কবুলের এক শক্ত অন্তরায়। হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি। এমনিতেও শব্দ দুটি একে অন্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। হিংসা যেমন চুলার আগুনের মতোই আমাদের নেক আমলগুলো পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, বিদ্বেষও তেমনি আড়াল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নেক আমলের সামনে। ইসলামে পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। কারও প্রতি শত্রুতাভাব বজায় রাখার নাম বিদ্বেষ। একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মানসিক অসুস্থতার শামিল। ইসলামে পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। হাদিসে বলা আছে, ‘তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না, তার মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি।বিদ্বেষের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলগুলো পেশ করা হয় এবং সব মুমিন বান্দার গুনাহ খাতা মাফ করে দেওয়া হয়; কিন্তু যাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও দুশমনি আছে, তাদের ক্ষমা করা হয় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তাদের ছেড়ে দাও, যেন তারা ফিরে আসে অর্থাৎ মিলে যায়।

বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকতে একটি কুরআনি দোয়া তুলে ধরা হলো-

{رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } [سُورَةُ الحَشۡرِ: ١٠]

অর্থ : ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু পরম করুণাময়।(সুরা হাশর : আয়াত ১০)

মুসলমানকে আল্লাহর পথে সংগ্রামে পরস্পরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় থাকতে বলা হয়েছে (ছফ ৬১/৪) । এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন

বিদ্বেষমুক্ত মনে আমরা পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারব এবং এর বিনিয়ে স্রেফ আল্লাহর নিকটে পারিতোষিক কামনা করব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবাইকে ভাই-ভাই হবার তাওফীক দিন- আমীন!

শান্তি বা সুখ যে জিনিসের মধ্যে পাবেন,

০১- ঈমান ও আমলের সালেহ ।

অশান্তি,চিরক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, ক্ষমা লাভ, চিরন্তন সাফল্য ও জান্নাতের সৌভাগ্য শান্তি অর্জন করা, পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বের কর্তৃত্ব লাভ করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করার পূর্বশর্ত হলো ‘ঈমান ও আমলে সালেহ্’।

সাফল্য অর্জনের জন্যে আমলে সালেহ্ ভিত্তি হতে হবে ঈমান।আর ঈমান বিহীন আমলে সালেহ্ নিষ্ফল। প্রকৃত পক্ষে ঈমান বিহীন আমল বা কাজকে আমলে সালেহ্ বলা যায়না।আমলে সালেহ’র জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং যেসব পুরস্কার ও শুভ প্রতিফলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা লাভ করবে কেবল তারাই, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো প্রাপ্য নেই।মোট কথা, আমলে সালেহ’র ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া ভালো কাজের ফল লাভ করা যাবেনা।এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ { [سُورَةُ النَّحْلِ: ٩٧]

অর্থ: ঈমান এনে যেকোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে, আমি তাকে দান করবো উত্তম পবিত্র জীবন এবং তাদের পুরস্কার দেবো তাদের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর ভিত্তিতে। (সূরা আন নহল:৯৭)

{ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا } [سورة ٨٨]

অর্থ: তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তার জন্যে থাকবে সর্বোত্তম পুরস্কার এবং তার প্রতি আমার বিষয়গুলো বলবো সহজভাবে। (সূরা আল কাহফ:৮৮)

★ অনন্ত পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের রাজপথ:

এই রাজপথের নাম 'ঈমান ও আমলে সালেহ্।' এই রাজপথের অপর নাম 'সিরাত আল মুস্তাকিম (সরল সোজা পথ)।' সিরাত বা পথ হলো 'ঈমান'। আল মুস্তাকিম (সরল সোজা) মানে- 'আমলে সালেহ্'। কুরআন মাজীদে 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহ্'কে মুক্তি ও সাফল্যের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ } [سورة البقرة: ٢٥]

যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তাদের সুসংবাদ দাও যে :তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যান আর বাগবাগিচা, সেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী ঝর্ণাধারা। আর তাদের জন্যে সেখানে থাকবে অনাবিল পবিত্র জুড়ি। (সূরা আল বাকরা:২৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন:

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ } [سُورَةُ يُونُس: ٩]

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের প্রভু তাদের ঈমানের ভিত্তিতে তাদের পরিচালিত করেন জান্নাতুন নায়ীম-এর দিকে, যেগুলোর নিচে দিয়ে থাকবে বহমান নদ-নদী ঝর্ণাধারা। (সূরা ইউনুস : ৯)

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٌ عَظِيمٞ } [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٩]

অর্থ: যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমার এবং মহা পুরস্কারের। (সূরা আল মায়িদা: ৯)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ – سورة الحج: ٥٠

অর্থ: 'সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক্ব।''

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا (١٠٧) خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلٗا (١٠٨) } [سُورَةُ الكَهۡفِ: ١٠٧-١٠٨]

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন। সেখান থেকে তারা স্থানান্তর হতে চাইবেনা কখনো। (সূরা কাহফ: ১০৭-১০৮)

ঈমান আনা ও 'আমলে সালেহ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই দু'টি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ মাফ হওয়া।

{ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ }
[سُورَةُ العَنكَبُوتِ: ٧]

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আমি অবশ্যি মিটিয়ে (মুছে) দেবো তাদের সমস্ত মন্দকর্ম এবং তাদের প্রতিফল দেবো তাদের উত্তম কর্মের ভিত্তিতে। (সূরা আনকাবুত : ৭)

অন্য এক আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেন:

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ } [سُورَةُ البَيِّنَةِ: ٧]

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাইয়্যেনাহ:০৭)

অতএব, ঈমান ও আমলে সালে মধ্যে রয়েছে সুখ ও শান্তি

কারো সে জীবন যদি হয় দুঃখের, কষ্টের, শাস্তির, যন্ত্রণার, দগ্ধের, দহনের, তবে তার চাইতে দুর্ভাগা আর কে আছে? পক্ষান্তরে যার সে জীবন হবে সুখের, সাফল্যের, পুরস্কারের, পরমানন্দের, তার মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছে?

আসুন, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সৌভাগ্যের আকাংখী নারী-পুরুষ,যুবক-যুবতী, কিশোর কিশোরী, সবাই মিলে চলি ঈমানের পথে। আসুন, আমলে সালেহ করি নিজের জীবনকে। আমীন,, আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের জন্যে প্রতিশ্রুত।

০২- আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করুন। নিজেকে শুদ্ধ থেকে অধিকত শুদ্ধ পরিশুদ্ধ করুন।

আখেরাত। সীমাহীন প্রাপ্তির স্থান। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ বলে কিছু নেই। আখেরাতের সব জিনিসের প্রাপ্তি দুনিয়ার তুলনায় সীমাহীন। নেয়ামত যেমন সীমাহীন; দুঃখ-কষ্টও সীমাহীন। যারা যেমন কাজ করবে; তারা তেমন ফলাফল ভোগ করবে।কিন্তু মানুষ কি জানে দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের প্রাপ্তি কেমন?

মানুষ যদি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার বাস্তবতা জানতে চায়, তবে তাদের জন্য এ হাদিসটি সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাহলো-

عن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما الدنيا في الآخرة إلا مِثْل ما يجعل أحدكم أُصْبُعَهُ في اليَمِّ، فلينظر بِمَ يَرْجع!» رواه مسلم

মুস্তাওরিদ ইবন শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণিত, “আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় অতঃপর দেখে তা কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে।”

হাদীসটির অর্থ: যদি তুমি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার বাস্তবতা জানতে চাও, তবে তোমার একটি আঙ্গুল সমুদ্রে রাখ তারপর উঠাও। তারপর দেখ কতটুকু পানি নিয়ে তোমার আঙ্গুল ফিরে আসে?! সমূদ্রের তুলনায় কিছুই নিয়ে ফিরে না। আর এটি হলো আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার হাকীকত। বস্তুত দুনিয়ার সামান্য জীবন ও ক্ষণস্থায়ী স্বাদের সাথে আখিরাতের দীর্ঘ জীবন, স্থায়ী স্বাদ ও নি‘আমতের তুলনা অথৈই সমুদ্র থেকে আঙ্গুলে লেগে আসা সামান্য পানির মতো।

★ নবী সাঃ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আখেরাতের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا- راوه الترمذي

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়ায় আমার কি? আমি ও দুনিয়া তো একজন পথিকের মত। যে একটি গাছের ছায়া তলে বসে আছে। ছায়া চলে যাবে এবং তাকে ছেড়ে যাবে'।তিরমিযী হা/২৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৯; মিশকাত হা/৫১৮৮ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা সেতুর এ প্রান্ত ও অন্য প্রান্তের ন্যায়। দুনিয়াতে মানুষ প্রতি পদে পদে সেতু পার হয়ে চলেছে। যখন যেখানেই তার মৃত্যু হবে, তখন সেখানেই সে তার জীবন সেতুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে। আর কবর হ'ল আখেরাতের প্রথম মনযিল। এখানে মুক্তি পেলে সে ক্বিয়ামতের চূড়ান্ত বিচারে মুক্তি পাবে। অতএব বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অপর প্রান্তে তথা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছানোর আগেই যথাযথ পাথেয় সঞ্চয় করা। যার মাধ্যমে সে জান্নাতের চিরস্থায়ী ফলাফল পেয়ে ধন্য হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও আখেরাতের বিষয়টি তুলে ধরেছেন-

اَرَضِيۡتُمۡ بِالۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا مِنَ الۡاٰخِرَةِ‌ ۚ فَمَا مَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيۡلٌ

'তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য।'(সুরা তাওবাহ: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

{ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىۡءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٌ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ } [سُورَةُ القَصَصِ: ٦٠]

‘আর তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না?’

★ সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। আখেরাতের সীমাহীন জীবনের প্রস্তুতি নিজেদের তৈরি করা। দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা। বস্তুত আখেরাতের চিন্তা-চেতনাই সব রোগ ও সমস্যার একমাত্র প্রতিকার,অপরাধ দমনের সার্থক উপায় এবং শান্তি এবং সুখের থাকার উপায়,,

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আখেরাতের সম্বল উপার্জনে পৃথিবীকে ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন। দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের সম্পদ অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

০৩ - তাকদীরের ফয়সালের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। ভাগ্যে যে রিসিক লেখা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন।

তাকদীর (আরবি: تقدير অর্থ : নিয়তি) হল নির্ধারিত ভাগ্য। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তার পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব কিছু নির্ধারণ করেছেন - এই বিশ্বাসকে ইসলামে তাকদীর বলা হয়। সবকিছুই তাকদীরের উপর নির্ভরশীল। অতএব,অযথা দুশ্চিন্তা করে নিজের শান্তির ঘুম হারাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারলেই সুখে এবং সৌভাগ্যবান হতে পারবেন।

তাক্বদীর লেখার সময় :আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক মানুষের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ-

‘আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি জগতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন আকাশ সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে’। মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯

★উলামায়ে কেরাম তাকদীরকে দু’ভাগে ভাগ করেন।

১. তাকদীরে মুবরাম। [অপরিবর্তনীয় (مبرم)]

২. তাকদীরে মাআল্লাক।[পরিবর্তনশীল (معلق)]

তাকদীরে মুবরাম হল, যা কখনোই পরিবর্তন হয় না। অনাদী থেকে আল্লাহর কাছে যা লিপিবদ্ধ আছে তাই সংঘটিত হবে।

আর তাকদীরে মুআল্লাক হল, যা ফেরেশেতাদের খাতায় লিখা থাকে। এই প্রকারের তাকদীর দোয়া বা বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে।যেমন মানষের জীবনে সুখ শান্তি এবং দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি মানুষের কর্মের উপর নির্ভর করে । কুরআন ও হাদীসে তাকদীর পরিবর্তনের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা এই প্রকার তাকদীরের ব্যাপারেই বলা হয়েছে।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ,

‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।’ [সূরা রা’দ, আয়াত: ৩৯]

আল্লাহ স্বীয় ফায়ছালার পরিবর্তন করেন যখন বান্দা তাঁর নিকটে দো‘আ করে। ছহীহ হাদীছে রয়েছে যে রক্ত সম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু বৃদ্ধি পায়।
আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ-
‘যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার রূযী বৃদ্ধি হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘায়িত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে’।

বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ
‘আল্লাহর ফায়ছালাকে কোন বস্ত্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না দো‘আ ব্যতীত’।
এই মর্মে সহীহ সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।
‘রাসূল (সা.) বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।’ [সুনানে তিরমিযী, হাদিস: ২১৩৯] ফাতহুল বারী ১০/৪১৬

তাকদীর বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। এ বিষয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি,অনর্থক,অযথা,অশান্তির কারণ

আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। তিনি আদি-অনন্ত ও অন্তর্যামী। আর সকল বিষয় ঘিরে আছে তাঁরই জ্ঞান। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

‘তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন’ (হজ্জ ২২/৭০)। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ-

‘আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও তা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহর) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই’ (আন‘আম ৬/৫৯)। তিনি আরো বলেন,

عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ-

‘তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে অনু পরিমাণ বস্ত্তও তাঁর অগোচরে নয়। আর তার চাইতে ছোট ও বড় সবকিছু সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে’ (সাবা ৩৪/৩)। হাদীছে এসেছে,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

‘রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় মুশরিকদের ছোট বাচ্চা সম্বন্ধে (তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে)। তিনি বললেন, আল্লাহ ভাল জানেন, সে (বড় হয়ে) কি আমল করত’।
(বুখারী হা/১৩৮৩; মুসলিম হা/২৬৫৯)
কুরআন-হাদীছের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন। এসবের অণুপরিমাণ তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। এমনকি মানুষ অন্তরে যে কল্পনা করে আল্লাহ তাও জানেন। সুতরাং এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে বা তাঁর অজানা কিছুই নেই।

★সতর্কবার্তা:
তাকদীর বিষয়ে আলী (রা:) সতর্কতা স্বরূপ বলেছেন:"তাকদীর হলো গভীর সমুদ্রের মতো, এতে ডুব দিতে যেও না; অন্ধকার পথে প্রবেশ করো না; আল্লাহ তা'য়ালার রহস্যসমূহের একটি তাকদীর, কাজেই তা উন্মোচন করার চেষ্টা করো না।"আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।
و الله تعالى أعلم بالصواب

★ তাকদীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্নোত্তর জানতে চাইলে নিচের লিংকে ক্লিক করুন,,,
https://alquranindex114.blogspot.com/2019/05/blog-post_72.html?m=1

তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা প্রয়োজনীয় ও অশান্তির কারণ।

০৪- আশাবাদী হওয়া। হতাশ না হওয়া। আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধা পোষণ করা ভালো ও কল্যাণের অপেক্ষা করা অবশ্যই কল্যাণ আসবে। আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়া।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না খুবই স্বাভাবিক। জীবনে সুখ ও সফলতা যেমন আনন্দিত করবে, তেমনি ব্যর্থতা ও কষ্টও জর্জরিত করবে। তবে মুসলমান দুঃখের দিনে ভেঙে পড়ে না। কখনও হতাশ হয় না। আশার আলো তার সামনে জ্বলতে থাকে। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ ۞ قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ } [سُورَةُ الزُّمَرِ: ٥٣]

বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। সন্দেহ নেই, তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

নিরাশ হওয়া বা হতাশা মুসলমানের গুণ হতে পারে না।

আশাবাদী হওয়া ঈমানদারের অন্যতম গুণ। আর নিরাশা ঈমানহীনতার আলামত।

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ খুবই দুর্বল প্রাণী। অল্পতেই হতাশ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন,

{ وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسٗا } [سُورَةُ الإِسۡرَاءِ: ٨٣]

‘আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি,তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর তাকে অনিষ্ট (বিপদ) স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে যায়।’(সুরা বনি ইসরাঈল :৮৩)।

আশাবাদী হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, যেমন বলা যেতে পারে, ইয়াকুব (আ) । তার ছেলে ইউসুফ (আ:) কে হারিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে একদিন না একদিন তিনি তার ছেলেকে খুঁজে পাবেন, তিনি কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে নিরাশা, হতাশাগ্রস্থ হননি। তিনি তাঁর অন্য সন্তানদের বলেন,

{ يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ } [سُورَةُ يُوسُفَ: ٨٧]

‘হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।’ (সুরা ইউসুফ : ৮৭)। এছাড়ো আরও ইতিহাসে সাক্ষী রয়েছে, ইব্রাহিম (আঃ☺ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কিন্তু সন্তান না হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ,হতাশাগ্রস্ত হননি। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি আশাবাদী ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেছেন,কিন্তু তিনি হতাশা হননি। মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সন্তান দান করেছেন, যখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। আল্লাহ চাইলে সব সম্ভব এ বিশ্বাস থেকে ঈমানদার বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয় না।হতাশা পাপের পথ সুগম করে। আর আশাবাদী হওয়া ঈমানদারেরই অন্যতম আলামত।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে। -সূরা আলাম নাশরাহ (৯৪) : ৫-৬

তাই হতাশ নয়; মুমিন হবে আশাবাদী। আল্লাহর রহমতের আশায় থাকবে সে; নিরেট পার্থিব বিষয় নিয়েও, দ্বীনী ও পরকালীন বিষয়েও।

সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর প্রতি যার বিশ্বাস থাকবে অটুট, তার অবশ্য হতাশ হওয়ার সুযোগ কোথায়! এ বিশ্বাস হতাশাকে দূর করবেই।

০৫- তাওয়াক্কুল করা অর্থাৎ দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও উদ্বিগ্নতায় আল্লাহর উপর ভরসা করা। যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর উপর সোপর্দ করে দেওয়া। তাঁর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর উপর আস্থা রাখা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা। ইসলামে তাওয়াক্কুল একটি ইবাদাত (উপাসনা)। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের উপর তাওয়াক্কুল করা শির্‌ক হিসেবে গণ্য হয়। ইসলামে তাওয়াক্কুল হল, মানুষ কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে আর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখবে।

তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন আয়াত বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٧]

"আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না।" [সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫৮]

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [ابراهيم: ١١]

"আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১১]

বান্দা যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে তো এর বিনিময়ে সে কী পায়? এর বিনিময়ে সে আল্লার ভালবাসা পায়। আল্লাহর নৈকট্য পায়।এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ [ال عمران: ١٥٩]

‘‘অতঃপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর।’’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

আল্লাহ তার অন্তরে শান্তি ও প্রশান্তি দান করেন এবং আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥ﴾ [الطلاق: ٣]

‘‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।’’ [সূরা আত-তালাক,আয়াত: ৩]

আল্লাহ বলেন,

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

‘অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর’ (হূদ ১১/১২৩)।

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ [الانفال: ٢]

‘‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।’’ [সূরা আল আনফাল, আয়াত: ২]

★ খলিফা ওমর ফারুক (রা:)যখন খলিফা ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যায়। তার সময়ে একদল লোক শুধু মসজিদে থাকতেন। বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করতেন না। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা কারা। এখানে একসাথে বসে আছো কেন। কোনো কাজ নেই তোমাদের। কোনো পেশা নেই। তারা তখন বলেছিল, আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি। তিনিই আমাদের খাবার জোগাবেন।

খলিফা ওমর রা: বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাজ করো, তারপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো। অন্যের ওপর ভরসা করো না।

তার মানে আগে আপনাকে শস্য রোপণ করতে হবে, এর পর ফসল তুলতে হবে। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তারপর ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এসব থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, সাবধানতা অবলম্বন করা। এটা তাওয়াক্কুলেরই একটি অংশ।

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা । এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ। এই বিষয়টাকে যদি আমরা আরো স্পষ্ট করতে চাই, তাহলে আরো একটি চমৎকার উদাহরণ টানা যেতে পারে। তিরমিযী শরীফের হাদীস রাসূল সা: পাখিকে মডেল হিসেবে ধরে এটি বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘তোমরা যদি সঠিক পন্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে চাও, তা হলে পাখিদের অনুসরণ করো।

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

‘তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহ’লে পাখ-পাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোর বেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে নীড়ে ফেরে’

প্রতিদিন সকালে পাখিরা শূন্য খালি পেটে খাবারের সন্ধান করে এবং নিজের চেষ্টায় খাবার অন্বেষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করে। তারপর সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের নীড়ে ফিরে। তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ঠিকই এবং নিজেদের চেষ্টা তারা চালিয়ে যায়। সকালে কোনো পাখি তার বাসায় বসে থাকে না। নিজের খাবারের সন্ধান করার জন্য নীড় থেকে বের হয়। তারা শহর থেকে মরুভূমিতে ছুটে বেড়ায় এবং খাবারের

সন্ধান করে। আল্লাহ লাখ লাখ পাখির সবার খাবারই দেন। কাউকে না খাইয়ে রাখেন না। কিন্তু তারা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যায়।’ ইসলামে তাওয়াক্কুল করার বিধি পাখিদের এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে হবে। তারপর তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর ওপর।

এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

সাহাবী আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর। (তিরমিযি)

সূরাতুল রা’দের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহর সাহায্যের প্রধানতম শর্ত হচ্ছে চেষ্টা করা।

{ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ } [سُورَةُ الرَّعۡدِ: ١١]

আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত একটা জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না , যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে। নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য আগে নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তারপর ভরসা করতে হবে আল্লাহর ওপর।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা‘আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে। (মাজমূ‘ ফাতাওয়া ও রাসাইলু ইবনে উছায়মীন ১/৬৩)।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, 'রিযিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন—কোনো যানবাহনে আরোহণ করেই গন্তব্যস্থলে কেউ নিরাপদে পৌঁছে যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই; বরং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে।

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, 'তাওয়াক্কুল হলো ইমানের অর্ধেক। আর দ্বিতীয় অর্ধেক হলো, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য শরিয়ত সমর্থিত বৈধ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।' তাই জীবনে চলার পথে আমাদের যেমন বৈধ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে হবে। তেমনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাও রাখতে হবে। এই দুই জিনিসের সংমিশ্রণেই সফলতা অর্জন সম্ভব।

★ তাওয়াক্কুল চার প্রকার:

(ক) বিপদ-আপদে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। কেননা শুধুমাত্র আল্লাহই বিপদ দূর করে কল্যাণ এনে দিতে পারেন। আর এটা করা ওয়াজিব এবং ঈমানের শর্ত।

(খ) সৃষ্ট জীবের উপর এমন বিষয়ে তাওয়াক্কুল করা যা সংঘটিত করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যেমন; মৃত ও অনুপস্থিত এবং এ ধরনের অন্যান্য তাগুতদের উপর ভরসা করা। অতঃপর প্রয়োজনের কথা তাদেরকে বলা, সাহায্য প্রার্থনা, রিযিকের জন্য ফরিয়াদ করা অথবা হেফাযতের আবেদন নিবেদন করা। এধরনের কার্যকলাপ তাওহীদ (একত্ববাদ) পরিপন্থী বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) জীবিত উপস্থিতদের উপর তাওয়াক্কুল করা; যেমন, আমীর-উমারা, রাষ্ট্রনায়ক ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহ ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন

সৃষ্টিজীবের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণের উপায়-উপকরণ ইত্যাদি দান করেছেন। এদের কারো উপর তাওয়াক্কুল ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঘ) কোনো ব্যক্তিকে উকিল বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করা। আর তা এমন বিষয়ে হতে হবে যা ঐ প্রতিনিধির নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে সমপন্ন করতে সক্ষম, যেমন: ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি। এ প্রকারের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা জায়েয। তবে উকিল বা প্রতিনিধিকে দায়িত্ব অর্পণের সময় ‘‘আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর তাওয়াক্কুল করলাম’’ বলা যাবে না। বরং বলতে হবে আমি অমুককে আমার পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি করলাম। কেননা যিনি যাকেই দায়িত্ব দিয়ে প্রতিনিধি করবেন তাকে অবশ্যই সার্বিক ব্যাপারে মহান পবিত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করতে হবে।

★তাওয়াক্কুলের (০৭) উপকারিতা:

০১- সব বিষয়ে আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যান।

০২- প্রশান্তি লাভ ।

০৩- শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ।

০৪- অকল্পনীয় রিজিক প্রদান।

০৫- বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ।

০৬- আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন।

০৭- শয়তানের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ।

সুতরাং একজন মুসলিম তার যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপর ভরসাকে একটা মুস্তাহাব বিষয় ভাবতে পারে না; বরং সে তাওয়াক্কুলকে একটি দ্বীনী দায়িত্ব বা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করবে।

০৭- বেশি বেশি যিকির করা।

যিকির শব্দের অর্থ কোনো কিছু স্মরণ করা, বর্ণনা করা, মনে রাখা বা মনে করা ইত্যাদি। যিকরুল্লাহ বলতে আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহর কথা বর্ণনা করা, আল্লাহকে মনে রাখা বোঝায়। মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত আমাদের স্রষ্টাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করা। অথচ আমরা খুব কমই স্রষ্টাকে স্মরণ করি এবং কৃতজ্ঞতা কমই প্রকাশ করি। কিন্তু

আল্লাহ তা'আলা যিকিরের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে গুনাহের বোঝা কমে যায়। আল্লাহ খুশি হন প্যারাশনি দূর হয়। ইসলামী শিক্ষার মূলকথা হলো, আল্লাহর বান্দা আল্লাহর হুকুম-মতো জীবন যাপন করবে এবং সকল কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করবে সর্বাবস্থায় বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ থাকবে, আল্লাহ তাআলার ভয় ও মুহাব্বত যখন তার অন্তরে স্থান করে নেবে, কেবল তখন সকল কাজে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে আত্মসমর্পন করা সম্ভব হবে এই জন্য বেশি বেশি যিকির করা ইসলামের একটি বড় শিক্ষা। যে ব্যক্তি বেশি বেশি যিকির পাঠ করে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয়, মর্যাদা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।এটা পরীক্ষিত সত্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।ইবাদত-বন্দেগির মূল বিষয় হলো আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করা।আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে অনেক বেশি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে কুরআনুর কারীমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرًا كَثِيرًا } [سُورَةُ الأَحۡزَابِ: ٤١]

'হে ঈমানদাররা! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ কর।' (সুরা আহযাব:৪১)

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন:

{وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ } [سُورَةُ الأَنفَالِ: ٤٥]

'তোমরা অনেক বেশি যিকির কর, তবেই সফলকাম হতে পারবে৷ (সুরা আনফাল: ৪৫)

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য স্হানে বলেছেন:

{ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ }
[سُورَةُ الجُمُعَةِ: ١٠]

অতপর সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা জুমআ:১০)

সবসময় সর্বাবস্থায় জিকির করা সম্পর্কেও কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা রয়েছে। যার ইচ্ছা সে বসে, শুয়ে, কাত হয়ে কিংবা সালাতে ও সালাতের বাইরে যিকির করতে পারেন। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন:

{ فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوۡقُوتًا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٠٣]

'অতপর যখন তোমরা সালাত শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর৷ অতপর যখন

বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন সালাত ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সালাত মুসলমানদের উপর ফরজ’ (সুরা নিসা:১০৩)

তবে মনে রাখতে হবে সব স্থানে যিকির করা যাবে না তা হতে পারে তথা টয়লেট বা নাপাক স্থান টয়লেট জাতীয় যে কোনো নাপাক স্থানে যিকির করা বৈধ নয়। অন্য আয়াতে বলেছেন,

{ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ } [سُورَةُ الرَّعۡدِ: ٢٨]

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্বরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। –সূরা রা’দ : ২৮

অন্য আয়াতে বলেছেন:

{وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةً وَأَجۡرًا عَظِيمًا } [سُورَةُ الأَحۡزَابِ: ٣٥]

আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহর প্রস্তত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার –(সূরা আহযাব : ৩৫)

★যিকির সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন বিভিন্ন হাদিসে,,,

হযরত মুআয রা. থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ইসলামের বিধান অনেক মনে হয়। তাই আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার

উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জিহবাকে আল্লাহর যিকিরে তরতাজা রাখ।–(জামে তিরমিযী:৩৩৭৫; ইবনে মাজাহ:৩৭৯৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত আবু সায়ীদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিছু মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন,আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়,এবং তাদের উপর ছাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটতম ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা উল্লেখ করেন – (সহীহ মুসলিম: ৭০০; শুআবুল ঈমান:৫৩০)

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অভিশপ্ত তবে আল্লাহর যিকির ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং আলেম ও তালেবে ইলম ছাড়া। (তিরমিযী:২৩২২; ইবনে মাজাহ:৪১১২)

★০৯টি শ্রেষ্ঠ যিকির সমূহ:

যিকির বলতে আমরা সাধারণ ভাষায় বলতে পারি, “আল্লাহর তায়ালার নাম স্মরণ করা কি জিকির বলা হয় ” অনেক জায়গায় অনেক রকম ভাবে জিকিরের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মূল পরিভাষায় বলা যায় যে,

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম, আল্লাহর প্রশংসা বড়ত্ব বয়ান করাকে জিকির বলা হয়।

০১. কুরআন তেলাওয়াত করা।

০২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ।

০৩. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

০৪. দুরুদ শরীফ পাঠ করা।

০৫. সুবহানাল্লাহ।

০৬. আলহামদুলিল্লাহ।

০৭. আল্লাহু আকবার।

০৮. আস্তাগফিরুল্লাহ।

০৯. আল্লাহর ৯৯ টি নাম।

আল্লাহ তা'আলা ৯৯ টি নাম রয়েছে এবং আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা যিকিরের জন্য উত্তম।

সাধারণত এগুলোই উত্তম যিকির সমূহ আরো অনেক আয়াত ও দোয়া সমূহ রয়েছে। এই ৯টি যিকির আল্লাহ তা'য়ালার কাছে খুবই প্রিয়।

★যে ৪ যিকির গুনাহ গাছের পাতার মতো ঝরে যায়। আল্লাহর যিকির করার অনেক বাক্য-কালেমা রয়েছে। তবে চারটি বাক্য আল্লাহর অনেক পছন্দ এ চারটি বাক্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা

বর্ণনা করি, তার প্রশংসা করি, তার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেই এবং তার বড়ত্ব-স্তুতি বর্ণনা করি এ চারটি বাক্য মানুষের গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেয় যেমন শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা চারটি বাক্য নির্বাচন করেছেন- সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার।(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৮০১২)

কুরআন ও হাদিস দ্বারা বর্ণিত এইসব যিকিরের অনেক ফায়দা,উপকার রয়েছে যিকির করলে আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত পাওয়া যায়। তাই আমাদের সবার বেশি বেশি যিকির করা উচিত।

০৭- তাদাব্বুরুল কুরআন; কুরআনের সাথে জীবন যাপন করা কুরআন মুখস্থ করা চেষ্টা করা। কুরআনের তেলাওয়াত শোনা অর্থসহ কুরআন বুঝার চেষ্টা করা।

তাদাব্বুর' একটি আরবি শব্দ যার অর্থ 'গভীর চিন্তা', 'গভীর ভাবনা' কুরআনে সরাসরি এই শব্দটি এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা কুরআনের ব্যাপারে 'তাদাব্বুর' তথা গভীর চিন্তা-ভাবনা করার কথা বেশ কয়েকটি স্থানে বলেছেন।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ أَفَلَمۡ يَدَّبَّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ أَمۡ جَآءَهُم مَّا لَمۡ يَأۡتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ } [سُورَةُ المُؤۡمِنُونَ: ٦٨]

'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা?'- আল মুমিনুনঃ ৬৮

অন্য আয়াতে বলেন:

{ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ } [سُورَةُ صٓ: ٢٩]

'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে'- সূরা ছোয়াদঃ ২৯

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٨٢]

'তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নাযিল হতো, তাহলে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেতো'- আন নিসাঃ ৮২

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ } [سُورَةُ مُحَمَّدٍ: ٢٤]

'তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'- সূরা মুহাম্মাদঃ ২৪

কুরআনকে গভীরভাবে বুঝতে না পারলে, উপলব্ধি করতে না পারলে কুরআনের শিক্ষাগুলোকে জীবনে

বাস্তবায়ন করা যায় না। কেমন দেখায় যে দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা আমার সাথে কথা বলছেন, অথচ তার কথার কিছুই আমি বুঝতে পারছিনা বোঝার চেষ্টা করছিনা!! খুবই খারাপ লাগার কথা না?

★অথচ আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা কুরআন নিয়ে গবেষণা করার জন্য বলেছেন সেটার একটি প্রমাণ সূরা হজ্জের আয়াতের মধ্যে।

{ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ } [سُورَةُ الحَجِّ: ٤٦]

তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে! বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে তাদের হৃদয়।' (সূরা হজ : ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

{ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ (١٧) وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ (١٨) وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ (١٩) وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ (٢٠) }[سُورَةُ الغَاشِيَةِ: ١٧ - ٢١]

'তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের প্রতি, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কীভাবে তাকে প্রথিত করা হয়েছে এবং ভূমির প্রতি, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে'। (সূরা গাশিয়া ১৭-২০)

এভাবেই আল কুরআনে গবেষণা ও চিন্তার চর্চার কথা বলা হয়েছে ভাবনা, উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলা হয়েছে, 'সৃষ্টি নিয়ে এক ঘণ্টা গবেষণা করা বছরের পর বছর ইবাদত করার চেয়ে বেশি মূল্যবান।

পবিত্র কোরআনে ১০০ এরও বেশি আয়াতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে, শোনে,মনোযোগ দেয়,তুলনা করে বা পরিমাপ করে,ভাবে,বুদ্ধি ও বিবেকের চর্চা করে এবং বিচার-বিবেচনা করে। সর্বোপরি মেধাকে যেন কাজে লাগায়।

বহু আয়াতের শেষাংশে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: তোমরা কি চিন্তা করে দেখছো না? তোমরা কি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?

তবে এভাবে জিজ্ঞাসা করার পাশাপাশি বহু জায়গায় বিশ্বের বিচিত্র অজানা রহস্য নিয়ে ভাবতে, গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।পাশাপাশি যারা চিন্তাশক্তি, মেধা ও মননকে কাজে লাগায় না তাদের অন্ধ, বধির এমনকি চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে তিরস্কার করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে: 'আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে,বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদের আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না।তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না।তারা পশুর মতো বরং তাদের চেয়েও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

এতকিছুর পরও যারা বিবেক–বুদ্ধি,মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করে না,তাদের অকর্মণ্য, উপলব্ধিহীন, অসচেতন প্রাণী বলে তিরস্কার করেছে।

সূরা আনফালে বলা হয়েছে:

{ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ (٢١) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ (٢٢) } [سُورَةُ الأَنفَالِ: ٢١-٢٢]

আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না,যারা বলে যে, আমরা শুনেছি,অথচ তারা শোনে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির,যারা উপলব্ধি করে না।'(সূরা আনফাল : ২১, ২২) প্রকৃতি নিয়ে, সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে, মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভেবে না দেখাকে আল্লাহ তায়ালা তিরস্কার করেছেন। কুরআনের বলেছেন–

{ أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمّٗىۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ لَكَٰفِرُونَ } [سُورَةُ الرُّومِ: ٨]

তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না, আল্লাহ আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রুম, আয়াত ৮)

যারা বিবেকশাসিত চিন্তা করে, আর যারা করে না, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভাবতে পারার ইতিবাচক পথকে অবলম্বন করে আর যারা করে না, যারা প্রজ্ঞা ও বিবেককে ব্যবহার করে আর যারা করে না, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন :

{قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ } [سُورَةُ الأَنْعَامِ: ٥٠]

'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? (সূরা : আনআম : ৫০) অতএব,মানুষের সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টির পার্থক্য হল,বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারঙ্গম। **আর এই উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রণোদনা দেয়া হয়েছে** হাদীসে**। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেষ্টা করতেন পথচলার ক্ষেত্রে যে রাস্তা দিয়ে একবার গেছেন বিকল্প থাকলে সেই রাস্তায় না** যেতে। **এর মানে হল মানুষের উচিত প্রতিদিনই নতুন নতুন পথের সন্ধান** করা। **একই পথ নিয়ে পড়ে না থাকা দুটি পথ থাকলে তৃতীয় পথ কী করে তৈরি করা যায় তা**

নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।এই চিন্তাকে জাগানোর জন্যই বারবার আহ্বান করেছে কুরআন।

কুরআনের তাদাব্বুর মানেই হলো কুরআন নিয়ে ভাবা। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। আমাদের জীবনে আমরা হয়তো অনেকবার কুরআন পড়েছি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও পড়বো।এখন, কুরআন পড়তে গিয়ে কুরআনের কোন ব্যাপারটা আমাকে একেবারে ভিতর থেকে নাড়া দিয়ে গেছে? কুরআনের কোন আয়াতটা পড়ে মনে হয়েছে- 'আরেহ! এই আয়াত তো মনে হয় আমার জন্য এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।আমি তো এই সমাধানই চাচ্ছিলাম। আমি তো এই কথাগুলোই ভাবছিলাম'। হয়নি এরকম কখনো? যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই সূরা, সেই আয়াত নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা, ভালোবাসা, ভালোলাগা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শেয়ার করুন। আপনার সেই অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য অনেককেও কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে সহায়ক হবে, ইনশাল্লাহ।

তাই গবেষণা ও চিন্তাচর্চা ছাড়া ইহ বা পরকাল কোথাও সফলতার আশা করা যায় না। চিন্তার মুক্তি মানুষের সফলতার প্রধান অবলম্বন গবেষণা ও চিন্তাশীলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো জাতি সমৃদ্ধ হতে পারেনি। চিন্তাগবেষণার কল্যাণে পৃথিবী আজ এতদূর অগ্রসর

হতে পেরেছে **ইহলৌকিক পারলৌকিক সব দৃষ্টিতেই চিন্তাচর্চার বিকল্প** নেই।

০৮ – ঘর-বাড়ি সন্তান-সন্ততি চেহারা সুরত চাকরি বাকরিতে যে, আপনার চেয়ে নিম্নমানের তার দিকে তাকানো। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন।আপনি হাজার মানুষ থেকে অনেক ভাল আছেন।

এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ هو أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ متفقٌ عَلَيْهِ،

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের চেয়ে কম সম্পদশালী মানুষদের প্রতি (পার্থিব ব্যাপারে) দৃষ্টি দিও, তোমাদের চেয়ে ধনশালী মানুষদের দিকে নয়। এতে করে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দেয়া নি'আমাতসমূহ নগন্য মনে হবে না। সহীহঃ ইবনু মা-জাহ (৪১৪২), মুসলিম।

★এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন:

اللَّهمَّ اجعَلني صَبورًا، اللَّهمَّ اجعَلني شَكورًا، اللَّهمَّ اجعَلني في عَيني صغيرًا، و في أعيُنِ النَّاسِ كبيرًا

অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল এবং শুকুর গুজার কারি বানান। হে আল্লাহ আমাকে আমার চোখে ছোট করেন। মানুষের চোখে বড় করেন।

★বিশ্ব বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে:

ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সাদী **(রহ)** তিনি কিছুদিন আর্থিক অসুবিধায় ছিলেন। এত আর্থিক অসুবিধায় ছিলেন যে, পায়ের জুতা কিনার মত উনার টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। কবি শেখ সাদী উনি হায়! আফসোস করে বললেন আমি এত বড় কবি আমার জুতা নাই এই আফসোস করে ঘর থেকে বের হয়ে বাজারে এক ভিক্ষুককে দেখতে পান। তিনি দেখতে পেলেন ভিক্ষুকের দুই পা নেই, এই দেখে কবি শেখ সাদী **(রহ)** সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমার জুতা নাই কি হয়েছে আমার তো দুই পা আছে। কিন্তু ভিক্ষুকের তো দুই পা নেই। তখন কবি বললেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তার চেয়ে অনেক গুনে ভালো আছি।

এই কাহিনী ঘটনা থেকে বুঝতে পারলাম অল্পে তুষ্টে সন্তুষ্ট থাকা এবং নিচের দিকে তাকানো উপরের দিকে নয় ।

এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

القناعة من الاسلام

অর্থাৎ অল্পে তুষ্টে সন্তুষ্ট থাকার নাম ইসলাম

০৯- সৌভাগ্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো পিতা-মাতার দোয়া হাসিল করা। অতএব, **তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।তাদের দোয়া আপনার জন্য যে কোন মন্দের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে** থাকবে।

পিতা-মাতার খেদমত অন্যতম ইবাদত মিরাজ রজনীতে সালাত ও সিয়াম ফরয হয় এবং মিরাজের চৌদ্দটি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথম হলো আল্লাহর সঙ্গে শরিক না করা ও দ্বিতীয় হলো পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে না। বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক সর্বাগ্রে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট দেবে না। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

۞ {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا (٢٣) وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا (٢٤) } [سُورَةُ الإِسۡرَاءِ: ٢٣-٢٤]

‘আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া তোমরা অন্যের উপাসনা করবে না।আর তোমরা পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।যদি তোমাদের সামনে তাদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহ’লে তোমরা তাদের প্রতি বিরক্তিকর কিছু বলবে না এবং তাদের তিরস্কারকরবে না।বরং তাদের প্রতি বলবে সম্মনসূচক নম্র কথা বলবে’ (ইসরা ১৭/২৩)

۞ {وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣٦]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। (সুরা নিসা:৩৬)

{ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًاۖ } [سُورَةُ الأَحۡقَافِ: ١٥]

‘আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।’ (সুরা আহকাফ:১৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

{ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ} [سُورَةُ لُقۡمَانَ: ١٤]

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি আমার এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।’ (সুরা লুকমান:১৪)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

{ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } [سُورَةُ العَنكَبُوتِ: ٨]

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা–মাতার সাথে সদাচারণ করতে, তবে যদি তারা প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরিক করাতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আনকাবুত: ৮)

★ এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার

অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মায়ের ।সাহাবী পুনরায় আবার প্রশ্ন করলেন, রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মায়ের।সাহাবী আবারও জানতে চাইলেন, রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। **এরপর সাহাবী জানতে চাইলে রাসূল (সা.) বললেন, তোমার** বাবার। **(বুখারী ও মুসলিম)।**

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন,

{وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا } [سُورَةُ الإِسۡرَاءِ: ٢٤]

'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন। **(সুরা বনী ইসরাইল: ২৪)।**

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,'পিতা-মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।' (ইবনে মমাজাহ।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিসম্পাত, তেমনি তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার

প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।' (বায়হাকি)।

★জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ- তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের খেদমত কর। কারণ তোমার মায়ের পায়ের সন্নিকটে তোমার জান্নাত' (সহীহ তারগীব হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৯৩৯)।

• সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। (জামে আত তিরমিযী)

• সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম-কোন আমল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ঠিক সময়ে নামায পড়া। সে বলল অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতা খেদমত করা।সে বলল তার পর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (সহীহ্ আল বুখারী ও জামে আত তিরমিযী)

• সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম.কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, তা হল- আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের সাথে অসদাচারণ করা কিংবা তাদের আঘাত দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (সহীহ আল বুখারী)

• সাহাবী আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ্র রাসূল ! পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কি এমন কোন পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি।নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্বী হ্যাঁ। চারটি সুরত রয়েছে

(১) পিতা-মাতা জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার,
(২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ,
(৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী ও
(৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা যাতে পিতা-মাতা দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।

(আদাবুল মুফরাদ)।

• আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার প্রতি সর্বাধিক উত্তম আনুগত্য হল তাদের

মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।(সহীহ মুসলিম)

★ সন্তানের উপর পিতা-মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

*জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো
০১- সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,
০২- ভালোবাসা,
০৩- মান্য করা,
০৪- সেবাযত্ন করা,
০৫- সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,
০৬- প্রয়োজন পূরণ করা ও
০৭- দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

*ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো:
০১- তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,
০২- ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,
০৩- তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,
০৪- তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা,
০৫- তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,
০৬- বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা,

০৭- কবর জিয়ারত করা।

• আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সব্বাইকে পিতা-মাতার বাধ্য,অনুগত সন্তান হিসেবে তাদের খেদমতে আমাদের কবুল করে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দিন আমীন।

১০- ইলমী শারয়ী দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَاْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।
ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قَبْلَ القَوْلِ والعملِ.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)
যে কোনো বংশের লোক, যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ, যে কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারেন; বরং ইসলামে তা কাম্য। কুরআন-সুন্নাহয় এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে কেউ ইলমের খোঁজে কোনো পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। -মুসনাদে আহমদ ১৪/৬৬

ইমাম তিরমিযী রাহ. এ হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন باب ما جاء في فضل الفقه অর্থাৎ ‘ফিকহের (দ্বীনের সহীহ সমঝ) মর্যাদা সংক্রান্ত বর্ণনা’।

ইলম অর্জন করা ফরয।দীন ও দুনিয়া যাই হোক না কেন, ইলম ব্যতীত মানুষ কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না। দীন ও দুনিয়ায় সফলতা লাভ করতে চাইলে ইলম অর্জ অতি জরুরী। তাই ইলম অর্জনকে ইসলামে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম অণে¦ষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। [সুনান ইবনে মাজাহ]

আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ।আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের মধ্যে প্রিয় হচ্ছেন নবীগণ। একজন সত্যিকারের আলিম নবীদের উত্তরাধীকারী হিসেবে মর্যাদা পাবার অধিকারী। এটি কতইনা সৌভাগ্যের বিষয়।

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীগণ দিরহাম ও দিনারের (বৈষয়িক কোনো সম্পদের) উত্তরাধিকার রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে বিপুল অংশ লাভ করেছে।" [সুনান আবু দাউদ: ৩৬৪৩]

মৃত্যুর পরও আলিমের আমল জারী থাকে

মানুষ মৃত্যুবরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আলিমের আমল জারী থাকে। একজন আলিম জীবিত অবস্থায় ইলম বিতরণ করার কারণে অনেকে উপকৃত হয়েছেন, সেজন্য মৃত্যুবরণ করেও তার সওয়াব পাবেন তিনি। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা অব্যাহত থাকে : সাদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।' [সহীহ মুসলিম : ৪৩১০]

আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়

কুরআর-সুন্নাহর ইলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য বড়ই সুসংবাদ যে, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট সকলেই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন আনাস ইবন

মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

صَاحِبُ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ .

'ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত।'' [সহীহ মুসনাদ আবী ই'আলা : ২/২৬০; সহীহ জামে' সগীর : ৩৭৫৩ কানযুল উম্মাল : ২৮৭৩৭]

মহাবিশ্ব ও এই পৃথিবীর মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি হিসেবে দ্বীন ইসলামকে শুধু পাঠিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং ইসলামকে জানা-বুঝারও নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামের জ্ঞানার্জন করার। ইসলামের বাস্তব শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি রাসূলও পাঠিয়েছেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষক ও আদর্শ নেতা হিসেবে বাস্তবে শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁর সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন।

২.কুরআনের আলোকে জ্ঞানার্জন

এখানে ইসলামের জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আল কুরআন থেকে মহান আল্লাহর কিছু বাণী উল্লেখ করছি :

১.সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। (মুহাম্মাদ-৪৭ আয়াত : ১৯)

২.তিনি আরো বলেন, 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞান) যা সে জানতো না। (আলাক্ব-৯৬ আয়াত : ১-৫)

৩.মানুষ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ যারা জানে এবং যারা জানে না তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান’? (যুমার-৩৯ আয়াত : ৯)

৪.আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরক্রমশালী ক্ষমাশীল। (ফাতির-৩৫ আয়াত : ২৮)

৫.তিনি আরো বলেন, আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা‘বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণও (সাক্ষ্য প্রদান করেন) তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা‘বূদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (ইমরান-৩ আয়াত : ১৮)

৬.সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর যাতে তারা নিজ কওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে, যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়। (তাওবাহ-৯ আয়াত : ১২২)

৭.তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (মুজাদালাহ-৫৮ আয়াত : ১১)

৮.বলো : প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (তোয়াহা-২০ আয়াত : ১১৪)

৯.যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। (আন নহল -১৬ আয়াত : ৪৩)

১০.আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে (তালুতকে) শাসক মনোনীত করেছেন, কারণ তাকে তিনি অঢেল মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন। (বাকারা-২ আয়াত : ২৪৭)

১১.আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। (বাকারা-২ আয়াত : ২৩৯)

১২.আল্লাহ অতি প্রশস্ত উদার মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, সে তো বিরাট কল্যাণের অধিকারী। শিক্ষা লাভ করে তো কেবল তারাই যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। (বাকারা-২ আয়াত: ২৬৮-২৬৯)

১৩.যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ (কর্মকৌশল) শিক্ষা দেয়, তোমাদের আরো শিক্ষা দেয় তোমরা যা কিছু জানো না সেগুলো। (বাকারা-২ আয়াত : ১৫১)

১৪.এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়ো না, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই। (ইসরাঈল-১৭ আয়াত : ৩৬)

১৫.আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। (ফাতির-৩৫ আয়াত : ২৮)

তাই আসুন! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

এক নজরে সম্পূর্ণ বইয়ের মূল আলোচ্য **বিষয়,**

চারটি জিনিস দুনিয়ার বুকে সৌভাগ্যের প্রতীক,

০১- সৎ স্ত্রী।

০২- প্রশস্ত জায়গা।

০৩- সৎ-প্রতিবেশী।

০৪- সহজ বাহন।

👉 **চারটি জিনিস দুনিয়ার বুকে দুর্ভাগ্যের প্রতিক,**

০১-অসৎ স্ত্রী।

০২-অপ্রশস্ত বা সংকীর্ণ জায়গা বাড়ি।

০৩- অসৎ প্রতিবেশী,খারাপ প্রতিবেশী।

০৪- খারাপ বাহন।

শান্তির বা সুখের তিনটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে,

০১- নিজেকে শান্তির জন্য তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ শান্তি বা সুখের জিনিস নিজে বের করে নিতে হবে।

০২- জীবনটাকে শান্তিময় করে পরিচালিত করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর তাঁর রাসূলের দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে।

০৩- আখেরাতে শান্তির জায়গা জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ হবে,
অর্থাৎ আপনার প্রত্যাবর্তন স্থল ভাল না মন্দ এই চিন্তা সর্বসময়ই মাথায় রাখতে হবে মানে আখেরাতের চিন্তা করতে হবে,

{ بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا (١٦) وَٱلۡـَٔاخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ (١٧) } [سُورَةُ الأَعۡلَى: ١٦-١٧]

বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ আখিরাতে জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ - آل عمران:185

★ **কিন্তু আফসোস কিছু মানুষ শান্তি খুঁজে বেড়াই অন্য কিছুর মধ্যে, মূলত এগুলোর মধ্যে শান্তির বিন্দুমাত্র কিছু নেই শুধু অশান্তি আর অশান্তি বিদ্যমান রয়েছে,**
সেগুলোর কিছু নমুনা আমি উল্লেখ করব,
০১- দুনিয়ার বুকে অনেক মানুষ সম্পদের মধ্যে শান্তি খুঁজে বেড়ায়,
মূলত সম্পদেই শান্তি নয় বরং তাতে অশান্তি বেশিরভাগ বিদ্যমান রয়েছে,
০২- প্রসিদ্ধতা, যশ,খ্যাতি,ভাইরাল,পপুলার, সেলিব্রেটি হওয়ার মাধ্যমে মানুষরা শান্তি খুঁজে বেড়ায়, অথচ এগুলোর মধ্যে কোন শান্তি নেই,

০৩- সার্টিফিকেট, ডিগ্রী লাভের মাধ্যমে শান্তি খুঁজে বেড়ায়।অথচ এগুলোর মধ্যে কোন শান্তি নেই, রাসুলের সাহাবীরা কোন সার্টিফিকেট ও পড়ালেখা কিছুই তাদের ছিল না, কিন্তু তাদের অন্তরের শান্তি নিহিত ছিল।

০৪- নেতৃত্বের মোহ,পদমর্যাদা–পদবী, অনেক মূর্খ মানুষরা মনে করে পদমর্যাদার মধ্যে কি না কি সুখ–শান্তি নিহিত রয়েছে,, দুনিয়ার বুকে যারা পদমর্যাদা নিয়ে লাফালাফি করেছে তারা সবচেয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে রয়েছে অথচ পদমর্যাদা সেটা নিজেই একটি অশান্তি কারণ,প্যারা দায়ক একটি জিনিস ।

যে জিনিসগুলো মানুষকে শান্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে

০১- কুফরী।

০২- গুনাহ, পাপ।

০৩- হিংসার হিংসাত্মক।

০৪- রাগ করা ।

০৫- জুলুম নির্যাতন ও অত্যাচার।

০৬- নেশায় আসক্ত হয়ে পড়া।

০৭- অন্যেরেরপ্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা।

০৮- কোন জিনিস কে কুলক্ষণ মনে করা।

০৯- অহংকার করা ।

১০- বিদ্বেষ পোষণ করা।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার মূলত তিনটি বিষয় একটিই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়।)

শান্তি বা সুখ যে জিনিসের মধ্যে পাওয়া যাবে।

০১- ঈমান ও আমলে সালেহ।

০২- আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করা।

০৩- তাকদীরের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

০৪- আশাবাদী হওয়া। হতাশা না হওয়া।

০৫- তাওয়াক্কুল করা।আল্লাহর উপর ভরসা করা।

০৬- বেশি বেশি যিকির করা।

০৭- তাদাব্বুল কুরআন। কুরআন নিয়ে গবেষণা করা।

০৮- ঘর-বাড়ি সন্তান-সন্তুতি চেহারা সুরত চাকরি বাকরিতে যে, আপনার চেয়ে নিম্নমানের তার দিকে তাকানো।

০৯-সৌভাগ্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো পিতা-মাতার দোয়া হাসিল করা। অতএব, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

১০- ইলমি শারয়ী দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।

পরিশেষে বলতে চাই, সাফল্য ও সৌভাগ্য একটি প্রতিযোগিতার নাম। এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় মায়ের উদর ছেড়ে পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথে; আর তা শেষ হয় মৃত্যুর পূর্ব শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে। সুখ শান্তির মাঝে সময়ের এই সমীকরণটুকুর নাম হল সৌভাগ্য। এ সাফল্য অতিক্রম পথ গুলোর দুর্গম। প্রতিটি পদে পদে লুকিয়ে আছে বিপদ। তা পিছলে গেলেই রয়েছে অত গহ্বরে তলিয়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা। যদি জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া যায় সৌভাগ্য শান্তির মাধ্যমে। তবে অর্জিত হবে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে সে দুনিয়ার বুকে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে আর আখেরাতে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'আলা বলেন:

{ تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا } [سُورَةُ مَرۡيَمَ: ٦٣]

যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী হবেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এই জান্নাত তাকে তিনি ওয়ারিশ হিসেবে দিবেন,

জান্নাত ওয়ারিশ করবেন তাদেরকে যারা তাকওয়ার অধিকারী হবে, আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে না তাদের জন্য সেই সুযোগ এবং সুসংবাদ নেই, সুতরাং থাকো অবলম্বন ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই।

জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে রয়েছে বেশ কিছু উপায় পথ এবং পদ্ধতি, উচ্ছল তারুণ্যের কঠিন এই সময়ে সঠিক দিক-নির্দেশনার সাথে সুন্দর এবং সফল জীবন গঠনের বিবিধ পরামর্শই মলাট বদ্ধ হয়ে এসেছে " কীভাবে সুখী হবেন? "

★ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন বইটি প্রকাশ করতে আল্লাহ তাদেরকে উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন। পাঠক!!! ভাইদের অতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কোনরকম ভুল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে অনুভবপূর্বক মেহেরবানী করে আমাদেরকে অবগত করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ছোট্ট খেদমত কবুল করুন আমীন।

★আমাদের সাথে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই নিচের লিংকে ক্লিক করবেন।
https://t.me/alim5802003
https://t.me/alibdQuiz580
https://www.facebook.com/MDAlimuddin580
https://twitter.com/MDAlimuddin2003
https://www.instagram.com/mdalimuddin2003/

★ যে বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে এই বইটি লিখতে সাহায্য পেয়েছি, নিচে তার লিংক দেওয়া :-
https://youtu.be/LGQNFtkgZwo
কিভাবে সুখী হবেন? বক্তব্যটি দিয়েছিলেন আমাদের সম্মানিত শায়েখ ডক্টর আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফি:) উনার বক্তব্য শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে এই বইটি লিখতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা শায়খকে এবং আমাদের সকলকে উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন

আমীন।

★ পিডিএফ (pdf) প্রস্তুতকারক:
শায়েখ মোঃ আআলীমুদ্দীন।
দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
alimuddinbd2003@gmail.com
+8801887637580

قال الشاعر : "من لم تكن
له بداية محرقة، فلن تكون له
نهاية مشرقة "
কবি বলেন: যার সূচনা কষ্টের হয়
না তার শেষটা উজ্জ্বল হয় না।

উপহার হিসেবে ফুলের চেয়েও মিষ্টি হাসি
বেশি মূল্যবান।

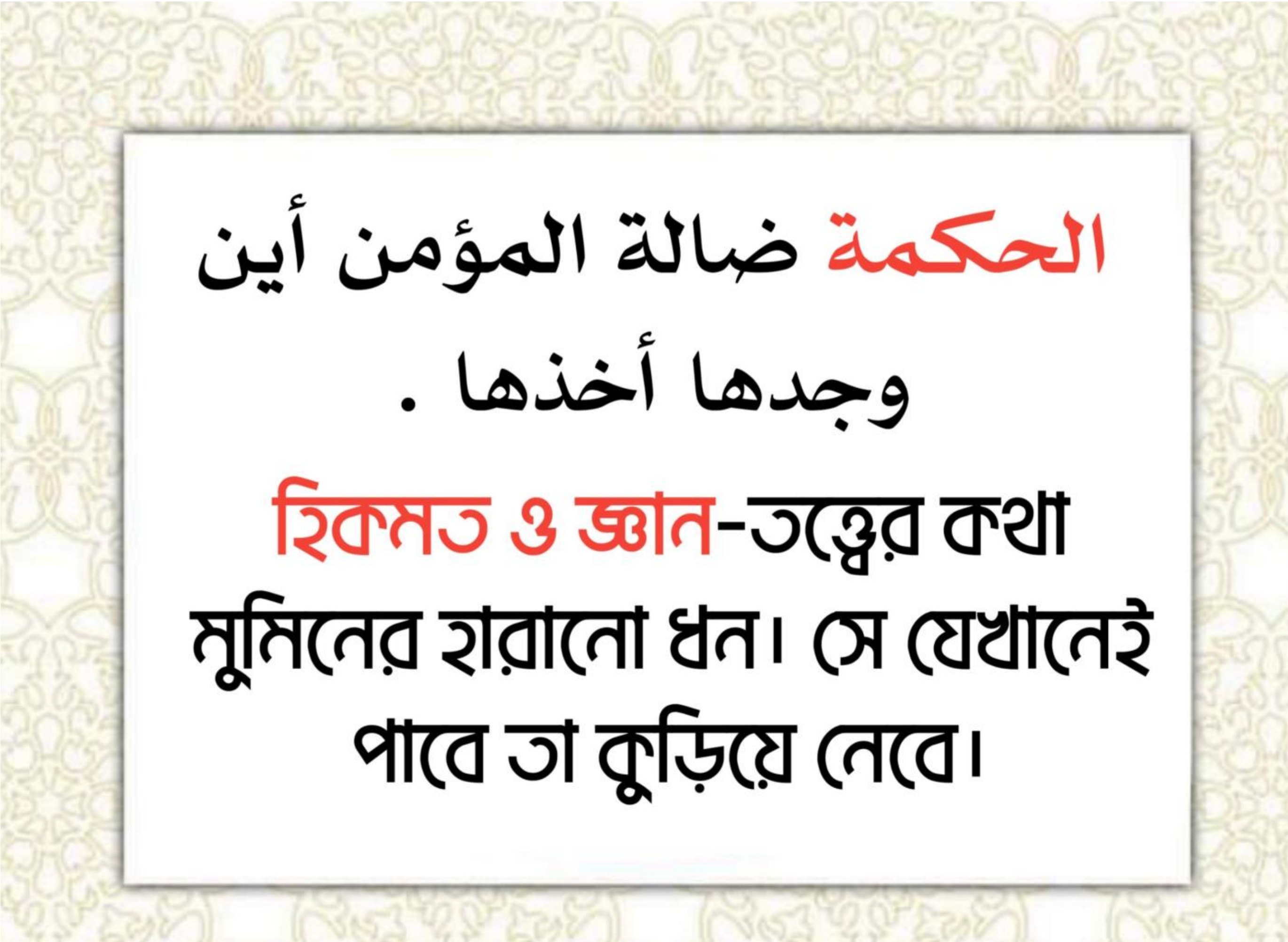
الحكمة ضالة المؤمن أين
وجدها أخذها .
হিকমত ও জ্ঞান-তত্ত্বের কথা
মুমিনের হারানো ধন। সে যেখানেই
পাবে তা কুড়িয়ে নেবে।

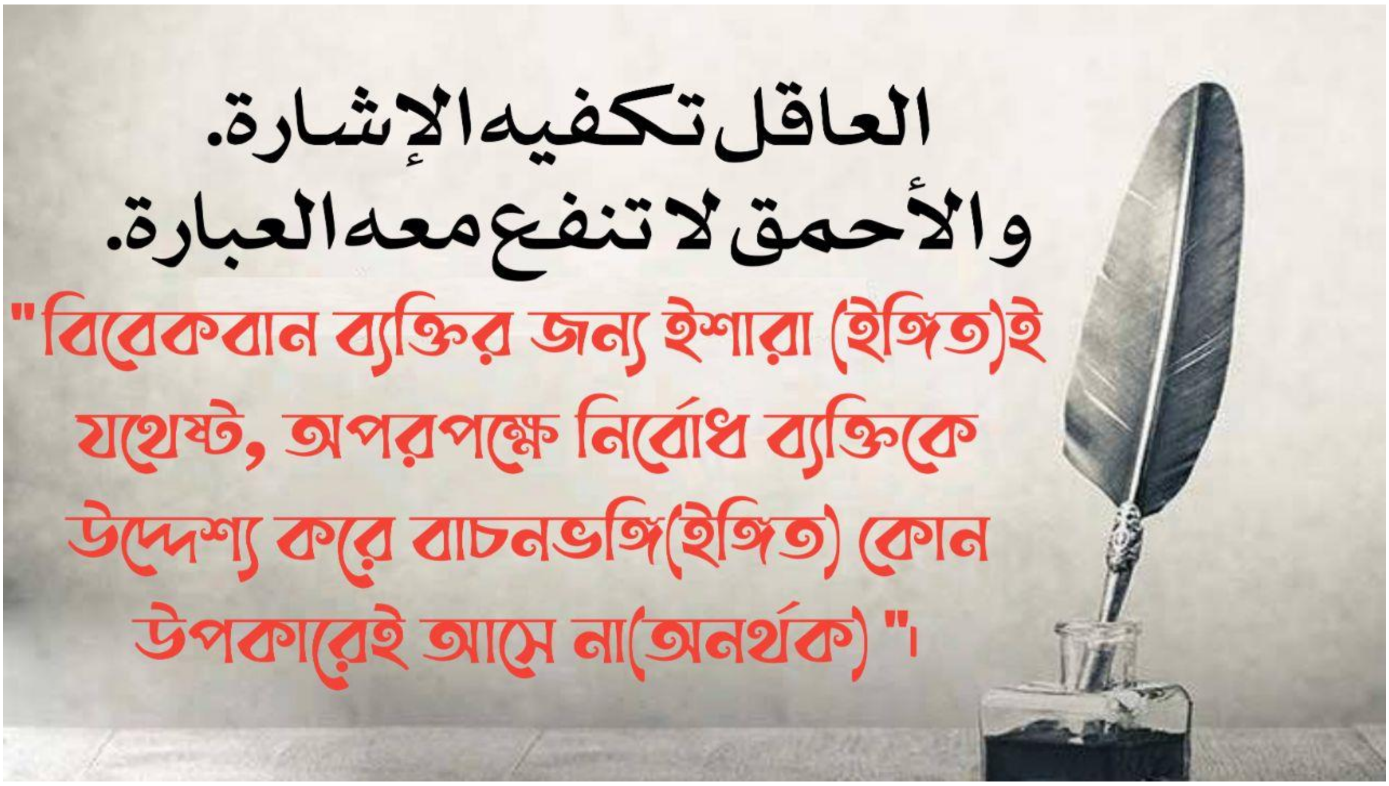
العاقل تكفيه الإشارة.
والأحمق لا تنفع معه العبارة.
"বিবেকবান ব্যক্তির জন্য ইশারা (ইঙ্গিত)ই
যথেষ্ট, অপরপক্ষে নির্বোধ ব্যক্তিকে
উদ্দেশ্য করে বাচনভঙ্গি(ইঙ্গিত) কোন
উপকারেই আসে না(অনর্থক) "।

★ আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই সম্পর্কে জুম'আর খুৎবা দিয়েছি ০২-০৯-২২ইং তারিখে,, বিষয়:- কীভাবে সুখী হবেন??

মানুষকে সম্মান করা সহজ কাজ! কিন্তু নিজে সম্মান অর্জন করা অনেক কঠিন কাজ!!

উস্তায,মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আস সালাফি (হাফি:)।

প্রিন্সিপাল,মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,যাত্রাবাড়ী,ঢাকা।

সততা থাকলে, শত্রুও মূল্যায়ন করে...

শাইখ মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আস সালাফি (হাফি:)

প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া
আরাবীয়া,যাত্রাবাড়ী,ঢাকা

“ নোট বুক “